উৎসর্গ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

মাটির গন্ধ
মন-কেতকী
দুরন্ত মন
অনির্ব্বাণ
আলপনার রঙ
একটি স্বাক্ষর
মহানগরী
জীবন-জল-তরঙ্গ
জীবন-জাহ্নবী
নিঃসঙ্গ
ফানুস
কাল-কল্লোল
মেঘলা আকাশ
শাশ্বত পিপাসা
মায়াজাল
মজানদীর কথা ইত্যাদি

গল্প

দুঃস্বপ্ন
মুহূর্ত্তের মূল্য
পটভূমিকা
আলেখ্য
আবর্ত্ত
ধূসর দিগন্ত ইত্যাদি

(যন্ত্রস্থ)

উপন্যাস

মায়া-মালঞ্চ

প্রথম পদক্ষেপ

ভ্রমণ-কাহিনী

দেউল-তীর্থ দ্রাবিড়

॥ এক ॥

বাবা তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে—মহা—দেব।

গেরুয়াধারী একদল মানুষ পথ দিয়ে চীৎকার করতে করতে চলেছে। দেহে গেরুয়া চাপালেও ওরা কৌপীনবন্ত সর্বত্যাগী নয়। ওরা মানত শোধের জন্য সন্ন্যাস নিয়েছে। কেউ একমাস, কেউ পক্ষকাল—কেউবা তিন দিনও অন্তত! ভিক্ষান্নে হবিষ্যান্ন আর ফলমূল খেয়ে পালন করবে ব্রত। সেইসঙ্গে কিছু কৃচ্ছ্র সাধনও চলবে। মাথায় তেল দেবে না, ভূমিতে শয়ন করবে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একঘরে বাস করলেও ওদের শয্যা স্পর্শ করবে না। সামান্য দিনের ব্রত—নিত্যদিনের অভ্যাসগুলি ছেড়ে মনে হয় জীবন-ভোরই চলচে বুঝি।

কিন্তু নূতন জীবনে উত্তেজনা আছে—আনন্দ আছে। গেরুয়া কাপড় পরে—মাথায় বা কোমরে গেরুয়া রঙের গামছাখানা বেঁধে—কপালে, বুকে ও হাতে গঙ্গামৃত্তিকা অথবা শ্বেত চন্দন লেপে পথ দিয়ে 'জয় মহাদেব' বলে চীৎকার তুলে যাওয়ার সময় নিজেকে আর সকলের থেকে আলাদা আলাদা মনে হয়। 'জয় মহাদেব' চীৎ-কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনপাত্র খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পথের দু'ধারে—বেপরোয়া জীবনের উদ্দাম হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে দীর্ঘ পথ মনে হয় অকারণেই ফুরিয়ে গেল!

এ পথেও অনেক যাত্রী—স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা। একটি নিয়মকে মেনে—নানা কামনার ভার বয়ে চলেছে পৃথক পৃথক। নীলদেবতা সকলকারই মনোবাসনা পূর্ণ করেন কিনা কেউ জানে না, কিন্তু তিনি যে মঙ্গলময় এ বিশ্বাস সকলের আছে।

আলুর দোকানে স্তূপীকৃত আলুর মাঝখানে দাঁড়িপাল্লা হাতে আশুরও বিশ্বাস—শিব মঙ্গলময়। অল্পে তুষ্ট বলে পূজার আয়োজন তাঁর সামান্যই; ত্রুটিবিচ্যুতিও ধরেন না। ভয়ের কিংবা ভক্তির, প্রার্থনা যাই হোক—তাঁর প্রসন্নতা লাভ হবেই। পূজার আচারবিচার নিয়ে যে দেবতারা মন্দিরের গর্ভগৃহে মহিমা বিস্তার করেন তাঁরা অনেক দূরের দেবতা। শিব হলেন মানুষের পরম আত্মীয় দেবতা,—ওঁকে ছুঁয়ে ফেললেও দোষ নাই; ওঁর মাথায় গঙ্গাজল ঢাল, ফুল বেলপাতার অর্ঘ দাও—মন্ত্র পড় কিংবা নাই পড় তুষ্ট উনি হবেনই—উনি যে আপনজন।

বাবা তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে—মহা—দেব।

আশুর দোকানের সামনে চৌমাথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে সন্ন্যাসীর দল। গেরুয়া রঙের চাদরখানার দু'প্রান্ত চেপে ধরেছে মেয়ে পুরুষ দু'জন মিলে। মেলে ধরেছে যাত্রার জন্য—মুখে জয়ধ্বনি দিচ্ছে দেবতার। আশু ঝুঁকে পড়ে দেখছিল দলটিকে।

কিরে আশু—হাঁ করে চেয়ে দেখছিস কি। সন্ন্যেসী হবি? বিষ্ণু রসিকতা করে হেসে উঠল।

যাঃ—যাঃ, মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে। আশু তেড়ে উঠল।

বিষ্ণু হাসতে হাসতে বলল, মাইরি বলছি—ইচ্ছে হচ্ছে—ওদের দলে ভিড়ে পড়ি। উঃ—কি চেহারা দেখেছিস মেয়েটার!

আলু নিবি তো নে—ঠাকুর-দেবতা নিয়ে হাসি মস্‌করা ভাল নয়। আশু বিরক্তিভরে বলল।

ইস্—তোর যে দেখি বেজায় সতীপনা! তবু যদি—, একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করতেই আশু বাঁশের লাঠি উঁচিয়ে বলল, আর একটি কথা কয়েছ কি—

বিষ্ণু নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বলল, কেন—অন্যায়টা কি বললাম! ঘরে তো মাগ নেই যে—যা খুসি তাই করতে পারবি

নে ? তোর তো খোলা খাজনা। হ্যা-হ্যা করে হাসতে হাসতে চলে গেল বিষ্ণু।

সেদিকে রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করে আশু ফিরে চাইল মেয়েটির পানে। এখনও গেরুয়া উত্তরীয় মেলে ধরে ভিক্ষা চাইছে—দু'জনে। পুরুষটির বয়স হয়েছে। বেঁটেখাটো চেহারা—কদমছাঁট চুলে পাক ধরেছে—মাথাটা যেন বর্ষাকালের বড় একটি কদম ফুল। হাতের শিরাগুলি নারকোলকাতার দড়ির মত মোটা মোটা—পাতলা চামড়া ঠেলে বা'র হয়েছে, কণ্ঠার হাড় দু'খানাও ঠেলে বেরিয়েছে—তার নীচে এক বুক কাঁচা-পাকা চুল। মেয়েটিকে ওর সঙ্গে মানাচ্ছে না। দিব্য ফরসা গোল-গাল গৌরবর্ণের আঁটসাঁট গড়ন—যৌবন-লাবণ্যে সতেজ দু'টি হাত আর ঢলঢলে একখানি মুখ—একটু খাঁদা-খাঁদা নাক—তাই যেন শ্রী এনে দিয়েছে মুখখানিতে। লাল পাড়ের গেরুয়া শাড়ীর কপাল-ছোঁয়া ঘোমটা—তার নীচে ভাসন্ত দু'টি চোখ—এদিক থেকে ওদিকে ফেরাতেই আশু কেঁপে উঠল। দোকানের পানেই একদৃষ্টে চাইছে মেয়েটি। দৃষ্টিতে অনুসন্ধানের আলো জ্বালিয়ে চাইছে। অনেকদিন আগেকার হারিয়ে-যাওয়া রত্নটিকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করছে যেন !

ও দোকানি, আলুর সের কত করে ?

পাঁচ আনা। অন্যমনস্কে উত্তর দিল আশু।

পাঁচ আনা ! পাঁচ আনায় পাঁচ পোয়া বল। তোমার যে দেখি গলাকাটা দর !

খদ্দের রাগ করে চলে গেল—আশুর ভ্রূক্ষেপ নাই। অন্য সময় হলে আশু মিনতি করত, রাগ করেন কেন বড়বাবু, আসুন, কেনা দামেই আপনাকে দিচ্ছি।

তখন ওদিকে মুখ ফিরিয়েছে মেয়েটি। গেরুয়া উত্তরীয়ে টান পড়েছে—এবার ওদের ফিরবার পালা।

আধবুড়ো সন্ন্যাসীর মুখখানা বিরক্তিতে আরও কদর্য দেখাচ্ছে। মেয়েটিকে হাত নেড়ে কি যেন বলছে।

এদিকে চেয়েছিল বলে বুঝি এই ভর্ৎসনা। কেন?

মোড় থেকে পূবমুখের রাস্তা ধরল ওরা। পশ্চিমমুখের রাস্তার উপরকার দোকান থেকে দেখল আশু—পা যেন চলতে চাইছে না মেয়েটির। পিঠের ভাঁজে ভাঁজে অনিচ্ছুক পদক্ষেপের চিহ্নটা সুস্পষ্ট। কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিচ্ছে বটে— ভক্তিতে গদগদ নয় সে স্বর। আর একবার কি পিছন ফিরবে না মেয়েটি?

দোকানের বাখারির মাচানে ছ'ই হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে পড়ল আশু—আর একবার কি চাইবে না মেয়েটি?

আশ্চর্য—মেয়েটি ফিরে চাইল। অতদূর থেকেও দৃষ্টির বিদ্যুৎ ছিটকে এসে আশুর সর্বাঙ্গে কাঁপন ধরিয়ে দিল। হঠাৎ দল ছেড়ে মেয়েটি দৌড় দিল পিছন দিকে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে আশুর মাথাটা ঘুরে গেল। সামনেই টলে পড়ছিল, ভাগ্যিস বাঁশের খুঁটিটা ওর কপালে ঠক্ করে আঘাত করে সম্বিৎ ফিরিয়ে দিল!

সম্বিৎ ফিরে পেল বটে—ফিরতে পারল না বর্তমানের কোলে। বর্তমানের নরম মাটি পায়ের তলায় অত্যন্ত আলগা হয়ে কোন্ অতলে নিয়ে গেল আশুকে। আশু ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল অতীতের রাজ্যে!

॥ ছুই ॥

পর পর ছ'টি সন্তান নষ্ট হওয়ার পর শিবের ছুয়ার ধরে যে ছেলেটি এলো—তার নাম আশুতোষ রাখলে অনন্ত। অনন্তর অবস্থা সচ্ছল নয়। এককালে বাজারে ছোটমত একটা মুদিখানার দোকান ছিল, তার আয়ে সংসার চলত। নিজের নিবুদ্ধিতার

জন্য।বিলেত পড়ে সে দোকান বহুদিন হ'ল উঠে গেছে। লেখাপড়া শেখেনি যে লেখাপড়ার কাজ জুটবে—মাথায় তরিতরকারির ঝাঁকা তুলে ফড়েটিগিরি আরম্ভ করল অনন্ত। সে আয়েও সংসার অচল হবার কথা নয়, কিন্তু এ গঞ্জে সে গঞ্জে মালপত্র গস্ত করতে গিয়ে আর একটি রোগে ধরল অনন্তকে। রোগে না ধরেও উপায় ছিল না। দেড় মন হু'মন তরকারির বোঝা মাথায় তুলে—হু'চার মাইল পথ হেঁটে এলে শরীরের রক্ত এমনিতেই জল হয়ে যায়। সেই জলকে আবার রক্ত করে তুলতে তেজী ওষুধের প্রয়োজন। জলকাদা ভেঙ্গে গঞ্জের হাটে পৌঁছেই শরীরকে তোয়াজ করার চেষ্টাই ছিল অনন্তের সঙ্গীদের প্রথম কাজ।

চল দাদা, মামার দোকানে। এক পাঁট টেনে শরীলটাকে জুতসই করে তবে ঝাঁকা তুলব মাথায়। সঙ্গীরা বলত।

অনন্ত প্রতিবাদ করত, না ভাই—ও সব আমার ধাতে সয় না।

ইস্—আমরাই যেন মায়ের পেট থেকে পড়ে মাল টানতে শিখেছি! কথায় বলে, শরীলের নাম মহাশয়
যা সওয়াও—তাই সয়।

ওরা হা হা করে হেসে উঠতো।

ক্রমে অনন্তেরও সয়ে গেল সব। শুধু সয়ে গেল না—মাল গস্ত করার আগেই শরীরকে তোয়াজ করার নেশাটা প্রবল হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে অন্য নেশাও। সেটি অবশ্য মাঝে মিশেলের নেশা।

অনন্তর বউ ভুবনমণি—এক একদিন ঝঙ্কার দিয়ে উঠত, বলি কাল রাত্তিরে ছিলে কোন্ যমের বাড়ী! যাও না—ভাত গেলো গিয়ে সেইখেনে।

কি করি—আকাশে মেঘ দেখে নদী পার হতে সাহস হলো

না। সব্বাই বলল—গঞ্জে রাত কাটিয়ে যাওয়াই ভাল—না হলে নৌকোডুবি হয় যদি। কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গী করত অনন্ত।

হত—আপদ যেত—আমিও ঝাড়া হাতপা হয়ে বাঁচতাম। পরের ছুয়োরে দাসীবিত্তি করে খেলেও এত জ্বালা যন্তরণা ভুগতে হত না। ভুবনমণি আরও উগ্রচণ্ডী হয়ে উঠত।

অনন্ত তাড়াতাড়ি সরে যেতো সামনে থেকে।

গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী আর বর্ষাকালের বৃষ্টি তো আছেই, শীতকালেও কেউ ডাকে সন্ধ্যাবেলায়, আবার অন্য কালেও একটা-না-একটা এমন ছুর্ঘটনা ঘটে যে, গঞ্জের বাজারে রাত না কাটিয়ে উপায় থাকে না। সপ্তাহে এমন এক আধদিন হয়ই :

ক্রমে ভুবনমণিরও এটা গা-সহা হয়ে গেল। গালি-গালাজ শাপশাপান্তে কোন ফলই হ'ল না,—বরং এসবের মাত্রা বাড়লে গরহাজিরা বাড়তে লাগল। কোলে সন্তান এলে ভুবনমণি ভাবল, এইবার হয়তো অনন্তর নেশা কেটে যাবে! আশ্চর্য— ছেলে হওয়ার আনন্দে নেশাটাও যেন জমাট হয়ে উঠল,' ছু'দিন ফুর্তি করে তবে বাড়ী ফিরল অনন্ত। আবার ছেলেটি যেদিন চলে গেল—সেই শোকেও নেশা জমল অনন্তর। তিন দিন বাড়ীছাড়া হয়ে রইল সে।

ছু'টি ছেলে মারা যাওয়ার পর চেপে ধরল ভুবনমণি, এ সব তোমার পাপেই ঘটছে—নীলের সন্ন্যেস নাও—পাপ কাটুক।

ওরে বাবা—অত কোটকেনারা নেয়ম-কান্নুন মানতে পারব না!

এক মাস না পার—এক হপ্তা সন্ন্যেস নাও। জিদ ধরল ভুবন।

না—না—, একটা দিন বলে মাছ ডিম না খেলে শরীর ছুর্বল হয়ে পড়ে! অনন্ত মাথা নাড়ল প্রবলবেগে।

অবশেষে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে তিনদিনের সন্ন্যাস নেওয়ালো

ভুবনমণি। সেই বারই গর্ভে এল সন্তান। নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হল —আঁতুরের আওতা কাটিয়ে বাইরে এলো—ছ'মাসে অন্নপ্রাশন হল ঘটা করে। অনন্তও যেন খানিকটা শুধরে গেল।

বলল, শিব ঠাকুরের দোর ধরে ছেলে হয়েছে—এর নাম থাক আশুতোষ।

ভুবনমণি হাসিমুখে বলল, বেশ নাম—খাসা নাম—রাশুতোষ।

॥ তিন ॥

এ হেন দেবদত্ত ছেলে যখন শশীকলার মত বাড়ছে—তখন অনন্ত একদিন অনন্তধামে প্রয়াণ করল। শোকপর্ব শেষ হলে—জীবনযাত্রা নির্বাহের কথাটি ভাবতে বসল ভুবনমণি। এমনিতেই সাচ্ছল্য ছিল না সংসারে, অনন্ত না থেকেও তার অভাবটা খুব বড় বলে বোধ হল না। সংসারে আর একটি প্রাণী এসেছিল ইতিমধ্যে। অনন্তের বড়দিদি। শ্বশুরবাড়ীর পাট চুকিয়ে ভায়ের সংসারে এসে ঢুকেছিল বেশ কিছুদিন আগে। বড় তুর্মুখো মেয়ে—তাকে সংসারে রেখে সংসার চালানো শক্ত ব্যাপার। শ্বশুরবাড়ীতেও রসনার দৌরাত্ম্যে ঠাঁই হয়নি—ভায়ের সংসারেও সে আলাদা হয়ে রইল। বলল, ভগমান পেটে দেননি যদি—পরাধীন হয়ে থাকব কেন! কথায় বলে—

ভেয়ের ভাত—
ভেজের হাত।

পরের হাততোলায় থাকব কি তুঃখে? তুঃখু-ধান্ধা করব—খাটব—খাব—বেড়াবো-চেড়াবো—গল্প-গাছা করব—কারও খাস-তালুকের পেরজা তো নই! তুমিও যে—আমিও সে!

সেইভাবেই থাকত বেচাকালী। ঠোঙা তৈরী করত, 'কলাই'এর ডাল বেটে বড়ি দিত, আটা ভাঙ্গত, বেশন তৈরী

করত, মশলা গুঁড়িয়ে দিত পাল-পার্বণে। চাল কাঁড়ানো—ডাল ভাঙ্গা—আবার কারও বা আঁতুর তুলে দিয়ে আসা—এমনি করেই চলত তার খাওয়া-পরা।

অনন্তর সঙ্গে ঝগড়া করত ভুবনমণির হয়ে, কখনও বা ভুবনমণিকে নাকের জলে চোখের জলে ভাসিয়ে ছাড়ত।

ভুবনমণি চুপি চুপি বলত তার সইকে, মানুষটা খাণ্ডার ভাই। ছুতোনাতায় কোঁদল করাই ওর স্বভাব। কোঁদল-নাড়ীতে পাক দেয় কিনা, কোঁদল না করতে পারলে ছটফট করে।

দিদির নাম বেচাকালী। তিন ছেলে আঁতুড়ে নষ্ট হওয়ার পর ওই মেয়ে। ওকে মা-কালীর কাছে বেচে দিয়ে দোষ খণ্ডেছিল।

ভাই মরে যাওয়ার পর বেচাকালী বলল,—আর দু'জায়গায় দু'হাঁড়ী ভাল দেখায় না বউ। ওই তো শিব-রাত্তিরের সলতে একটা ছেলে—ওকে মানুষ-মুনুষ করে তুলতে হবে তো! তুইও চাল-ডাল কেঁড়ে দে, মশলা গুঁড়ো, ঠোঙা তৈরী কর—চলে যাবে কোনক্রমে।

দেখ ঠাকুরঝি, আমি ভাবছি—মিত্তিরবাড়ীর কাজটা নেই। দশটা করে টাকা। ভুবনমণি বলল।

দাসীবিত্তি করবি! চোখ কপালে তুলে অবাক হয়ে রইল বেচাকালী। বলি এতে যে ভাইএর মুখে চুণকালি দেওয়া হবে—বুঝছিস নে!

ভুবনমণিও শক্ত ধাতের মেয়ে। একটুও না দমে বলল, তোমার ভাইএর গুণের কথা দেশের কোন্ লোকটা না জানে! নতুন করে চুণকালি পড়বে না মুখে।

তবু পরের বাড়ী—, দমা গলায় বলল বেচাকালী।

যার ঘর নেই, অন্ন যোগাবার মানুষ নেই—তার পরই বা কি, আপনই বা কি! নিজের গতর খাটিয়ে খাব, চুরি করব না—ভিক্ষে

করবি না—বাজারে গিয়ে নামও লেখাব না। পরিষ্কার গলায় জবাব দিল ভুবনমণি।

বেচাকালী থ' হয়ে রইল। ভাই'এর আওতায় বৌয়ের এই প্রখর রূপটি সে দেখতে পায়নি এতদিন। বুঝল এ-ও শক্ত কাঠ, ভাঙবে তবু নুইবে না। তার কলহস্পৃহা কখন অন্তর্হিত হয়ে গেল—বৌয়ের অনমনীয় চরিত্রের একটুখানি আস্বাদ পেয়ে মনে মনে পুলকিত হল।

আশুতোষকে মানুষ করে তুলবার ভারটা ওরা যৌথভাবেই তুলে নিলে।

নিঃসন্তান বিধবা মানুষ বেচাকালী—কলহের উত্তাপে স্নেহের উৎসটা শুকিয়ে ছিল এতদিন। কাউকে শান্তি দেয়নি—কেউ আমলও দেয়নি ওকে। কচি ছেলেমেয়েকে কোলে টেনে নেওয়ার সুযোগ পায়নি এযাবৎ। আশু ওর কোল জুড়ে বসল। এবং মন জুড়েও। রুদ্ধ-মুখ উৎসটা হঠাৎই খুলে গেল। ভুবনমণির ভালই লাগল এটা। তবু যা হোক—মনের উত্তাপটা জুড়িয়ে-আসার একটা বস্তু পেয়ে গেল।

সংসারে কলহ কচকচির সুরটি এবার অন্য পথ ধরল।

দেখতো বউ—রেশোর গায়ে কেন ধুলো? কেউ মেরেছে নিশ্চয়। দাঁড়াও—তার ঝাঁড়ে পা দিয়ে আসছি। প্রায়ই বলে বেচাকালী।

তখনও ভাল করে মানুষ চিনতে পারে না আশু—কারও নামও বলতে শেখেনি। হয়তো চলতে গিয়েই পথে আছাড় খেয়েছে। কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য করবে কেন বেচাকালী! সদর দরজা খুলে বেচাকালী গলা ছেড়ে গাল পাড়তে থাকে, যমের অরুচিরা—মরেও না! এই কচি ছেলের গায়ে হাত তোলে কোন্ আক্কেলে? হাতে যে কুড়িকিষ্টি হবে—মুখ যে গলে খসে পড়বে—

তারপর আশু যখন মানুষ চিনতে পারল—নাম বলতে পারল—তখন বেচাকালী মারমুখো হ'য়ে ধেয়ে গেল তাদের কাছে। গলা ফাটিয়ে বলল, ওরে অলপ্পেয়ে—ওরে ভরড্যাকরা যমেখেগো—এই দুধের বাছার গায়ে হাত তুললি কি বলে? তোর মা মাগীই বা কেমন—

হয়তো সেই ছেলেটির মা এই অভিযোগ খণ্ডন করতে এলো। আমায় কেন দুষছো দিদি, ছেলেয় ছেলেয় কি করলে—

ছেলেয় ছেলেয় অমনি মারামারি করে বুড়োদের আস্‌কারা না থাকলে? ওরা তো দুধের বালক—ওদের কী-ই বা জ্ঞান। বেচাকালী হুল ফোটাতে লাগল।

তারপর ও পক্ষও যদি চড়া কথা বলল তো বেচাকালী লাফিয়ে উঠল।

শ্রান্ত হবার মেয়ে বেচাকালী নয়—তবু অবিরত চীৎকারে যদি তার গলাটা ভেরে আসে কিংবা গলা ভেঙ্গে যায়—ভুবনমণি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে দোয়ার ধরে। দু'জনে পালা করে এমন চেঁচায় যে নাওয়া-খাওয়ার কথা মনেই থাকে না।

প্রতিবেশিনীরা ওদের উদ্দেশে নমস্কার করে ছড়া কাটে:

দুর্জনকে পরিহার,
দূরে থেকে নমস্কার।

গ্রামের লোকে বলে, রহলা-দহলা।

কেউ কেউ বলে, ডাকিনী-যোগিনী।

॥ চার ॥

জ্ঞান হওয়ার পর আশুরও আবছা-আবছা মনে পড়ে—ওদের দু'জনের প্রশ্রয়ের পক্ষপুটে ভর করে ও কেমন করে

বে-পরোয়া হয়ে উঠল। গোঁসাইদের আমবাগানের মাঝখানে নোনাআতা ধলাআঁকড়া আর কালকাসুন্দার একটা ঝোপ ছিল। ওই ঝোপের মাথায় ঘন হয়ে উঠেছিল গোয়ালেলতা। তারই পরিষ্কার তলায় বসে পাড়ার ইস্কুল-পালানো তিন চারটি ছেলে মিলে আড্ডা জমাতো। সেই আড্ডাতেই প্রথম সিগারেট টানতে শেখে আশু। চার পয়সা প্যাকেটের কড়া সিগারেট। ধোঁয়াটা গলার মধ্যে যাবামাত্রই কাসতে কাসতে দম বন্ধ হবার জো। সেটাও অল্পদিনে আশ্চর্যভাবে সামলে নিয়েছিল আশু। ছ'মাস যেতে না-যেতে একটানে একটা সিগারেট শেষ করেছিল বাজী ফেলে।

পাকা সিগারেটখোর ফেলারাম ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিল, ভ্যালা মোর ভাইরে—অভ্যেস রাখলে বড় তামাকের ছোট কলকেও ফটাস করতে পারবি। ক্ষণজন্মা পুরুষ তুই!

কথাটা বেচাকালীর কানে তুলেছিল—গোঁসাই-বাড়ীর মেজ-গিন্নী। ওগো-আশুর পিসি,—বল্লে না প্রত্যয় যাবে—দোতলার বারান্দা থেকে দেখলাম—আমবাগানের মধ্যিখানে কে যেন আখায় আগুন দিয়েছে! ভাল করে দেখি—মূর্তিমানরা সিগরেট খাচ্ছেন! গাল টিপলে দুধ বেরয় সব কালকের ছেলে—কলি আর কাকে বলে! আশুকেও দেখলাম।

গোঁসাই-গিন্নীকে মান্য করে চলে বেচাকালী—চোটপাট করতে পারল না। শুধু বলল, সেদিন তো বলেছিলেন, নজরের জুৎ নেই—ওই অতদূর থেকে কাকে দেখতে হয়তো কাকে দেখেছেন।

ওমা—তোমাদের আশুকে আমি চিনিনে—কোঁকড়ানো চুল-কাঁধে পড়েছে—কোমরে কোঁচার খুঁটটা ফেরতা দিয়ে জড়ানো—মাথা ঝাঁকিয়ে কথা কয়—যাত্রার দলে সখী সেজে গান করল—এই তো চন্দনযাত্রার দিন—

আচ্ছা দিদি—বাড়ী আসুক—শাসন করে দেব। অপ্রসন্ন গলায় জবাব দিল বেচাকালী।

আর ইস্কুলে ভর্তি করে দাও—পড়াশুনো করুক। যে বয়সের যা—এখন পড়াশোনা না করলে ব্যাদড়া হয়ে যাবেই তো। উপদেশ দিলেন মেজগিন্নী।

বেচাকালী গজ গজ করতে করতে বলল, কালই ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছি—বার করছি ওর বদমায়েসী!

আশু বাড়ী এলে বেচাকালী আর ভুবনমণি দু'জনেই শুধোলেন, হাঁরে রাশু, তুই নাকি গোঁসাই-বাগানের ঝোপে বসে বসে সিগ্রেট খাচ্ছিলি?

আশু নিরীহ-মুখে বলল, সিগ্রেট!

হাঁরে,—গোঁসাইদের মেজগিন্নী ছাদ থেকে দেখেছেন। বললেন, পাড়ার যত সব বয়াটে ছেলে মিলে—

আশুর বিস্মিত মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, বুঝেছি।

কি বুঝেছিস্?

নিরীহমুখে বলল আশু, একদিন মেজ-গিন্নী আমাকে বলেছিল—গোটা কতক কাঁচা আম পেড়ে দিবি বাবা—কচি আমের অম্বল খাব। তা আমি বললাম, ওই মগডালে উঠতে পারব না তো। বলেন তো ঢিল মেরে—আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উনি বলল, ঢিল মেরে পাড়তে কসুর কর কিনা তোমরা। নীচের ডালে আম বল্‌তে একটিও নেই। রাগ হল কথা শুনে—বললাম, পারব না। ব্যস্—সেই থেকে দেখি মুখ ভার-ভার—সামনে পড়লে কথাই বলে না। আজ আবার কেমন মিথ্যেমিথ্যি লাগিয়ে গেল দেখ!

বেচাকালী ভুবনমণির দিকে ফিরে বলল, শুনলি তো বউ। ও আমি জানি, মেজগিন্নীটি কম নন—মিটমিটে ডান। ওরা দুধের ছেলে, সন্দেশ রসগোল্লা খাবে—গজা পক্কান্ন খাবে—ফুরুলি

বেগুনি খাবে—ওরা কোন দুঃখে শুকনো ধোঁয়া খেয়ে পেট ভরাতে যাবে! ওসব তোষ্কানে কথা।

ভুবনমণি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক বলেছ ঠাকুরঝি। লোকে তো কারও ভাল দেখতে পারে না। শুদ্দুর ভদ্দর সবই যে এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো!

কথাটা উড়িয়ে দিলেও মনের কোণে খটকা লেগে রইল। ভুবনমণি পরের দিন বলল, ঠাকুরঝি—রাশুকে না হয় ইস্কুলেই দেব—তবু পেটে বিদ্যে হবে তো।

তা মন্দ কি—জাত ব্যবসার মুখে সাত ঝাঁটা—মাথায় মোট করে ফড়েটিগিরি! তার চেয়ে ফরসা জামা-জুতো পরে বাবুদের মত চাকরি করুক গে। মান বাড়বে কত। সমর্থন করল বেচাকালী।

একটু ভেবে বলল, তা মাইনে নাগবে তো? বইও নাগবে।

ভুবনমণি বলল, রাজু মাষ্টারের বাড়ীতে কাজ করি তো—ওনাকে বলে কয়ে মাইনেটা যাতে না নাগে—

আর আমিও দেখি গে—কোন আবাগের বেটার কাছে বইপত্তর পাওয়া যাবে কি না। ও ইস্কুলে গেলে আমাদেরও হাড় জুড়োয়, দেখ্‌ দেখ্‌ করে পাড়া চষতে হয় না!

॥ পাঁচ ॥

ইস্কুলের কথাও মনে পড়ে আশুর। ভালই লাগত না। সাত বছর বাঁধনছাড়া হয়ে যা-খুসী-তাই করে বেড়ানোর পর নিয়মের রশি গলায় পরে নিরীহ সুবোধ ছেলে হবার চেষ্টাটা খুব সোজা নাকি! প্রথম দিন ইস্কুলে গিয়েছিল—নতুন জিনিসের স্বাদ নিতে। তার পরদিন কিছুতেই যাবে না। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে হাতে একটা আনি দিয়ে কোনক্রমে পাঠানো

হয়েছিল। তৃতীয় দিন ইস্কুল যাবার পথে গোঁসাইদের বাগানে লুকিয়ে রইল—সবাই ইস্কুল থেকে ফিরলে ও-ও ফিরল। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় সব ফাঁস হয়ে গেল।

রাজু মাষ্টার ডাল কাঁড়াতে দিয়েছিলেন,—নিতে এসে বললেন, হ্যাঁগো পিসি—আজ আশু ইস্কুলে যায়নি কেন?

বেচাকালী আকাশ থেকে পড়ল, ওমা সেকি কথা—কোন্ পেরাতঃক্কালে আলুভাতে ভাত খাইয়ে পাঠিয়ে দিলাম যে! তবে হয়তো অন্য ঘরে বসেছিল।

রাজু মাষ্টার বললেন, তা কি করে হবে পিসি! যে যার ক্লাসে বসবে তো। অন্য ঘরে উঁচু ক্লাসের ছেলেরা পড়ে।

তবে? হাঁক পাড়লেন বেচাকালী। রাশু—ওরে রাশু—

আশু বোকা নয়, রাজু মাষ্টারকে বাড়ী ঢুকতে দেখেই পিঠটান দিয়েছিল।

পরের দিন ইস্কুল কামাই করতে সাহস করল না। কি জানি রাজু মাষ্টার যদি বাড়ীতে এসে খোঁজ নেন। ভারী বদ্‌রাগী মাষ্টার—রোজ দু'গাছা করে ভাঁটের বেত ছেলেদের পিঠে ভাঙেন। সব ছেলেই ওঁকে যমের মত ভয় করে।

ক্রমে ক্লাসেও মন বসল। আশুর সঙ্গীসাথী জুটল। ভাল ছেলেরা বসে সামনের বেঞ্চে—মাষ্টারদের ডান ধারে। বাঁ ধারে খারাপ ছেলেদের বেঞ্চ। সেও সামনাসামনি। কোন কোন দুষ্টবুদ্ধি মাষ্টার উল্টোদিক থেকে পড়া ধরেন—পড়া না পারলে বেত ধরেন। মাঝখানটাই সবচেয়ে নিরাপদ—এদিক ওদিক যেদিক থেকেই পড়া ধরা হোক, কচিৎ পৌঁছয় ওখানে। দূরে বসে পড়ার বই খুলে—গাছের ডালে শালিক পাখীর বাসায় ক'টা বাচ্চা হয়েছে সে হিসাব অনায়াসে করা যায়।

দু'একটা বছর মন্দ কাটল না। বর্ণ পরিচয় শেষ হ'ল—ক্লাস প্রমোশনও পেলে। গোল বাধল ক্লাস ফাইভে উঠে। তখন

তিন মাস পরে বিদ্যে ধরা পড়ল—ক্লাস প্রমোশন পেল না আশু।

কাঁদো কাঁদো মুখে বাড়ী এসে বইখাতা দাওয়ায় আছড়ে বলল, আর ইস্কুলে যাব না।

বেচাকালী সবে জপে বসেছিল—ভুবনমণি রান্নাঘরে বালতিতে সোডা সাজিমাটি গুলে ক্ষার তৈরী করে ময়লা কাপড়গুলো তাতে ডুবোচ্ছিল। দু'জনেই কাজ ফেলে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো।

কি রে—কি হয়েছে?

আশু কাঁদতে কাঁদতে বলল, মাস্টার-মশায় কেলাসে উঠিয়ে দিল না।

কেন—কেন? দু'জনে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো।

বলল—তুই কিছু নম্বর পাসনি—পাস করতে পারিস নি। আশু চোখ কচলাতে লাগল।

নম্বর কি! দু'জনে অবাক হয়ে পরস্পরের পানে চাইল।

আশু খিঁচিয়ে উঠল, সে তোমরা বুঝবে না—মুখ্যুর ডিম! নম্বর না পেলে ছেলেরা পাস হয় না—কেলাসে উঠতে পারে না।

একটু ভেবে বেচাকালী বলল, নম্বর কে দেয়?

খেঁকিয়ে উঠল আশু, কে আবার দেবে—মাস্টার দেয়।

তবে? সবাইকে দিল—তোকেই বা দিল না কেন? অবাক হয়ে শুধোল ভুবনমণি।

বেচাকালীর কণ্ঠ চড়ল, বলি মিনি মাইনেয় তো নেখা-পড়া শেখায় না! তোকেই বা দিল না কেন?

কেন—তার আমি কি জানি! জিজ্ঞাসা করগে মাস্টারদের। আশু ঝেঁজে উঠল।

জিজ্ঞেস করবই তো। উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল বেচাকালী। মাস্টারের পেটে পা দিয়ে আসছি—দাঁড়াও। সবাইকে দেবে নম্বর আর

আমাদের ছেলে বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছে! মাথার ওপর পুরুষমানুষ নেই বলে বুঝি—যা ইচ্ছে তাই করবে! তোর মাস্টারের নিকুচি করেছে! এক পাক ঘুরে উঠোনে নেমে এল বেচাকালী।

ঠাকুরঝি—আমিও যাব কি? ভুবনমণি শুধোল।

তুই খারে কাপড় ক'খানা সেদ্ধ করে নে। আমি একলাই মাস্টারের ছেরাদ্দ করে আসচি। বীরদর্পে হন্‌হন্ করে বাড়ীর বা'র হয়ে গেল বেচাকালী। কিন্তু ফিরে এলো পরমুহূর্তে। বলল, হ্যাঁরে রাশু, কোন্ মাস্টার রে?

একদিন পড়া বলতে পারেনি বলে পূর্ণ মাস্টার আশুকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। আরও দু'দিন ছেলেদের দিয়ে কান মলিয়েছিলেন। পিঠ তো জগন্নাথ-ক্ষেত্র—যে কোন বেত—তা সে কঞ্চির ভাঁটের কালকাসুন্দার যাই হোক্ না—যখন তখন ওখানে এসে আপ্‌সে পড়ছেই। পূর্ণ মাস্টারের উপর অনেকদিনের ক্রোধ জমেছিল। আশু তৎক্ষণাৎ বলল, পূর্ণ মাস্টার।

ওঃ—তামলি পাড়ার পুন্ন ধনী! জেতে বেনে—কত আর হবে! দাঁড়া আজ দেখাচ্ছি ওকে মজা!

কিন্তু ততদূর গড়াল না ব্যাপারটা। পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন রাজু মাস্টার। বেচাকালীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনে ঢুকে পড়লেন বাড়ীতে। বললেন, ব্যাপার কি পিসি?

এই দেখ তো ভাইপো—আমাদের রাশুকে নাকি পুন্ন মাস্টার কেলাসে উঠিয়ে দেয়নি! তা তোমরাও তো পাঁচজন ছিলে, বলে কয়ে—

রাজু মাস্টার আশুর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলে বললেন, এই যে মূর্তিমান! পড়াশুনো না করলে গোল্লা মার্কা পাবি—তা কি জানিস্ নে? একি মই দিয়ে ছাদে ওঠা—যে উঠে গেলেই হল!

বেচাকালীর পানে ফিরে বললেন, ছেলেটির দিকে নজর রেখ পিসি—সন্ধ্যের পর নাকি নূতন বাজারের যাত্রার আড্ডায় গিয়ে গান শেখে।

না বাবা, ওসব শত্তুরের রটনা। বাছা আমার মাস্টার-বাড়ীতে নেকাপড়া করতে যায়। বেচাকালী সামলাবার চেষ্টা করল।

কোন্ মাস্টারের বাড়ী? কত মাইনে দাও? জিজ্ঞাসা করলেন রাজু মাস্টার।

মাইনে তো নেয় না মাস্টার—

এমন মাস্টার কে আছে পিসি যে ওকে অমনি অমনি পড়া বলে দেয় রোজ? হাঁরে বাঁদর, কার কাছে পড়তে যাস? চোখ পাকিয়ে আশুর পানে চাইলেন।

গতিক মন্দ দেখে আশু তখন উধাও হয়ে গেছে।

রাজু মাস্টার বললেন, ওসব কথা বিশ্বাস করো না পিসি—পড়াশুনো ও কিছুই করে না—যাত্রার আখড়ায় যায়। ওর ইহকাল পরকাল যদি ঝরঝরে করতে না চাও তো ওর প্রতি একটু মনোযোগ দিও।

রাজু মাস্টার চলে গেলে ভুবনমণি নেপথ্য থেকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। বলল, তুমি ভাল করে সন্ধান নাও ঠাকুরঝি—রাজু মাস্টারের কথা বিশ্বাস হয় না।

বেচাকালী নরম সুরে প্রতিবাদ করল, রাজু তো তেমন নয়,—মিছি মিছি নাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে ওর নাভ!

ভুবনমণি বলল, যার নাভ সেই জানে। সবাই তো বলে ওর মনটা ভাল নয়, কুচুক্কুরে মানুষ।

ভাল করে খোঁজ নিয়ে যা জানল বেচাকালী—তাতে মনটা ভার হয়েই রইল। আশু সেই থেকেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—ওর সঙ্গে মোকাবিলা না করে স্বস্তি পাচ্ছে না বেচাকালী।

ভুবনমণি একবার বলেছিল, শত্তুর-পুরীতে বাস ঠাকুরঝি—কাকেও বিশ্বেস নেই।

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠেছিল বেচাকালী, আর আচাভূয়োর মত কথা বলিস নে বউ! হাতে দই, পাতে দই, তবু বলে কই কই! ওর নাড়ীনক্ষত্তরের খবর নিয়েছি,—যাত্রার দলে নাচউলি সেজে খ্যামটা নাচ নাচে রেশো।

সতর্ক হয়ে রইল বেচাকালী—ওকে হাতেনাতে ধরতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পা টিপে টিপে বাড়ী ঢুকল আশু। পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দিকে গেল—আস্তে আস্তে শিকল খুলল। খুট্ খুট্ খুট্ খাট্ শব্দও হল খানিকটা।

বেচাকালী হাসল মনে মনে। পেটের জ্বলুনি যাবে কোথায়! চালভাজার ঘটিটা পেড়েছে নিশ্চয় শিকে থেকে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাটিটাও নিয়েছে। তেল নুন কোথায় থাকে জানা আছে। আহা, খাক দু'টো চালভাজা! হাজার হোক ছেলে-মানুষ তো—ফেল-করার শোক না পেলে চোপরদিন বাইরে বাইরে ঘুরবে কেন! কাল আর একবার মাস্টারদের বলতে হবে। ভাল কথায় বুঝিয়ে বলতে হবে, না হ'লে হুপভাঙ্গা হবে যে ছেলেটা।

চালভাজা খাওয়া সেরে রান্নাঘরের বাইরে এলো আশু। এ ঘরের দিকে না এসে সদর দরজার পানে চলল ফিরে। ভর সন্ধ্যেবেলায় আবার যাচ্ছে কোথায়? যাত্রার আড্ডায়?

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ডাকল বেচাকালী, রেশো—কোথায় যাচ্ছিস রে?

এক জায়গায় যাচ্ছি। তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল আশু।

সেতো জানি। কিন্তু কোথায়? গলা চড়াল বেচাকালী।

আশুও চড়া গলায় বলল, যেখানেই হোক—তোমার অত খোঁজে দরকার কি।

সারাদিনের রুদ্ধ আক্রোশ ফেটে পড়ল এই উত্তরে। গর্জ্জন করে উঠল বেচাকালী, আমার কি! তুই উচ্ছন্নয় যাবি—গোল্লায় যাবি—আর আমরা কিছু বলতে পারব না! বলি তুই কি স্বাধীন হয়েছিস! উপাজ্জন করছিস? মাথার খামিজ নেই বলে যা ইচ্ছে তাই করবি! নিজের মুখে চুনকালি মাখাচ্ছিস—আমাদের গালেও চুনকালি দিচ্ছিস—তবু হায়া নেই, নজ্জা নেই!

আশু হু'হাত নেড়ে পাক খেয়ে উঠল, যা-যা ভারি আমার পিসি রে! আমার যা খুশী তাই করব—পড়ব না—লিখব না। যাত্রা করব—গান করব নাচব—তোর বাবার কি!

ছট্‌কে বেরিয়ে গেল আশু।

বেচাকালী খানিক থ হয়ে রইল। আশু যে মুখের উপর এমন রূঢ় করে বলতে পারে এ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ভুবনমণি চেঁচামেচি শুনে দাওয়ায় এসেছিল—তার পানে নজর পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল বেচাকালী, শুনলি, শুনলি বউ, তোর ছেলের কথা! আমায় বলে কিনা—তোর বাবার কি? আমার বাবা ওর কে হয় জিজ্ঞেস কর দিকি? এমনও আকাট মুখ্‌খু বংশে জন্মাল কেমন করে বউ!

কথাগুলো ভাল লাগল না ভুবনমণির। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কেমন করে জানব ঠাকুরঝি তোমাদের বংশের কথা—ওর তত্ত্ব তুমি জান ভাল!

কথা তো নয় তপ্ত জলের ছিটে। সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলছে। তবু চড়া কথা বলতে পারল না বেচাকালী। এ যেন হয়েছে চোরের মায়ের কান্না! যে ছেলের হয়ে এতকাল লড়াই করে এসেছে—ঘরে আর বাইরে, সে যে এমন করে বিঁধবে কে জানত আগে! তবু চুপ করেও রইল না সে। বলল, পর গোত্তরে দিয়েছিল বাবা, সেই গোত্তরের খবরই রাখি। এখেনের মান-মজ্জাদা যাদের ওপর দিয়ে গেছে—তারা বুঝুক গে। আমার

কলা। পুড়তে হয় পুড়বে তাদেরই মুখ। দুটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এক করে বার দুই দুলিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো বেচাকালী।

সে রাত্রিতে জলস্পর্শ করল না। অনেক সাধ্যসাধনা করল ভুবনমণি—তবু তার মন টলল না।

সকালবেলায় ছেলেকে বলল ভুবনমণি, তোর পিসি যে রাগ করে রয়েছে রাশু—কাল রাত্তিরে কিছু খায়নি।

থাক্‌গে। আশু নিস্পৃহস্বরে বলল।

তুই পায়ে ধরে মাপ চা—

ইস্—কেন? পারব না। ঘাড় বাঁকিয়ে রইল আশু।

তাহলে আমাকেই ইস্কুলের ভাত রাঁধতে হয়—

ইস্কুলে যাচ্ছি কিনা!

ওমা—তাহ'লে কি করবি? ভুবনমণি অবাক হল।

কেন—বাবা যা করত তাই করব।

ফড়েটিগিরি? ওই অত বড় ঝাঁকা তুলতে পারবি মাথায়?

ছোট ঝুড়িতে করে তরকারি নিয়ে যাব। না হয় বড়ি—তেঁতুল—এই সব বেচব। আশু সাফ জবাব দিল।

নক্ষ্মী বাবা—অমন করিস নে! অনুনয় করল ভুবনমণি।

ঘাড় বাঁকিয়ে আশু বলল, কি করচি! আমি পড়ব না—পড়ব না—পড়ব না। ফের যদি পড়ার কথা বল—যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। যাত্রার দলে গেলে পাঁচুদা বলছিল—মোটা মাইনে হবে।

ভুবনমণিও অতঃপর নির্বাক হয়ে রইল।

॥ ছয় ॥

বেশ মনে পড়ে আশুর—যাত্রার দলে ক'টা বছর কি আনন্দেই না কেটেছে! নতুন বাজারের ওই সখের দলেই অবশ্য থাকেনি। কাছেপিঠের গ্রামগুলিতে দলাদলি তো কম নয়—যাত্রার দলও আছে প্রত্যেকটিতে। যখনই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গাওনা করতে গেছে—ওর অভিনয়-দক্ষতা ও কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে দর্শকরা ধন্য ধন্য করেছে,—অন্য দলের অধিকারীস্থানীয়রা ওকে প্রলোভন দেখিয়েছে নিজেদের দলে টানবার জন্য।

চমৎকার কেষ্টর পাট হয়েছে তোমার। আমরা ওর থেকেও একটা ভাল পালা খুলছি—মানভঞ্জন। তাতে কেষ্টই সব্বেসব্বা। আসবে আমাদের দলে?

না—পাঁচুদা রাগ করবে। আশু হয়তো জবাব দিয়েছে।

পাঁচুদা রাগ করবে কেন! সবাই ভাল দলে যায়। শহরে তোমাদের দলের বায়না হয়না তো—আমরা কত বড় বড় শহরে ঘুরি। কত বড় বড় লোক—উকিল ডাক্তার জজ ম্যাজিষ্টার সব আমাদের পালা শুনতে আসে। সোনার মেডেল দেয়—রূপোর মেডেল দেয়— মেয়েরা নেমন্তন্ন করে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়ায়।

সত্যি? আশুর চোখ চক্ চক্ করে উঠল।

সত্যি না তো মিথ্যে নাকি! তা ছাড়া প্রতি আসরে আমরাও প্লেয়ারদের টাকা দিই। এক টাকা—দু'টাকা—পাঁচ টাকা। যার যেমন পাট—তেমন রেট।

একদল ছেড়ে অন্য দলে আসবে সে আর বিচিত্র কি। পনেরো বছর বয়স বইত নয় আশুর।

এখন টাকার সঙ্গে জিনিসপত্রও আদায় করতে শিখেছে আশু। পুজোর সময় ভাল পাম্পসু চাই। শান্তিপুরী ফুলপাড় ধুতি চাই।

সিল্কের পাঞ্জাবী চাই। আজ সিনেমা দেখব—কাল সার্কাস। বর্ষার দিনে হিঙের কচুরি আর মাংস। কি পেঁয়াজি ফুলুরি হাঁসের ডিমের তরকারি। কতদিন যে রাজভোগ খাইনি! একদিন মোটরে করে বর্দ্ধমানের রাজবাড়ী দেখিয়ে আন না—কি কেষ্ট-নগরের বারদোলের মেলা।

এমনি বায়না নিত্যনূতন। বাড়ীতেও ছিটেফোঁটা প্রসাদ আসে। কখনও এক ভাঁড় ক্ষীর—কখনও বা আধ সের রসগোল্লা।

ভুবনমণি পাড়ার পাঁচজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ভাগ্যিস আমার রাশুর চাকরি হয়েছিল, দুটো ভালমন্দ জিনিস মুখে দিয়ে বাঁচছি।

বেচাকালী আলাদা হাঁড়ী কেড়েছে সেই থেকে। মুখের ধারটা তার কমেছে। আজকাল পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা জমেছে। আশু যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে কোন কথা বলে না। ও চলে গেলেই মুখ খোলে। বলে, আমার আর জানতে বাকী নেই কাউকে। কে কার? নিজের পেটের ছেলেই বলে পোঁছে না—এতো ভাইপো! এক গোত্তরেও নয়—মলে আগুনটুকু পাবার পিত্যেশ নেই। খাইয়ে পরিয়ে আদর-যত্ন করে এত বড়টি করলাম কিনা—এখন আমাকেই ভূ দেখাচ্ছে! কথায় বলে:

পরের হুলো খায়—
আর বনের পানে ধায়।

মরুগ্‌গে কে কার! হরি তুমিই ভরসা! হরিবল—হরিবল।

॥ সাত ॥

এ হেন সুখের চাকরিও একদিন ছাড়তে হল আশুকে। সে দিনের কথা আজও জ্বলজ্বল করছে মনে।

গাওনা ছিল চন্দননগরে মিত্তিরবাবুদের বাড়ীতে। বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন- সাতদিন ধরে যাত্রা, বাইনাচ, কীর্ত্তন, ঢপ চলছে। মফঃস্বলের এই দলটি অভাবিতভাবেই বায়না পেয়ে গেল। এই গাঁয়ের একজন লোক ছিল সম্পর্কে অধিকারীর ভাই। বাবুর এস্টেটের করিৎকর্ম্মা লোক—বাবুর অন্তরঙ্গ পার্শ্ব-চরদের অন্যতম। তারই সুপারিশে গাওনা করতে এলো সিদ্ধেশ্বরী অপেরা পার্টি। পালা গাইবে মানভঞ্জনের।

পালা আরম্ভ হবার আগেই দলটির ডাক পড়ল বাবুর বৈঠকখানায়।

এমন বৈঠকখানা জীবনে দেখেনি আশু। এক ইঞ্চি পুরু গদির উপর দিয়ে হেঁটে যেতেই বুকটা ধড়াস্-ধড়াস্ করে উঠছিল। যা সব আলো জ্বলছে ঘরে—যা সব ছবি আর দেয়ালগিরি—আর হরিণের সিং, বাঘের মুখ, বাঘের ছাল দিয়ে সাজানো দেয়াল—রং করা ছাদ ফুঁড়ে কি বাহারে বাহারে কাঁচের ফুলপাতাওয়ালা আলোর ঝাড় সব ঝুলছে দেখলেই মাথা ঘুরে যায়। ঘরটায় এমন খোসবু ছুটছে যেন গোলাপ-চামেলি বেলা যুঁই হাস্নুহানা রজনীগন্ধার হরিরলুট দিয়েছে কে! ঘরের আধখানা জুড়ে ফরাস পাতা। তিন ইঞ্চি পুরু উঁচু গদি, তার উপর বকের পালকের মত ধবধবে চাদর পাতা—তার উপর তাকিয়ার ছড়াছড়ি। একটা রং-চঙে বড় থালায় ফুলের মালা—তার পাশেই একটা বড় গড়গড়া—তার পাশে রং করা কাঠের বাক্সোয় সাদাকালো কতকগুলো বোতল—গায়ে সোনালী তার

জড়ানো—মুখে সোনালী ছিপি আঁটা। গেলাস, চায়ের কাপ আরও কত কি রয়েছে এধার ওধার। অবাক-চোখে চাইতে চাইতে এগুচ্ছিল আশুরা, যেখানে একটা তাকিয়ার উপর আড় হয়ে পড়ে আছেন বাবু—হাতে গড়গড়ার নলটি আল্‌তোভাবে ধরা। চওড়া কালা পাড় ফিন্‌ফিনে ধুতির কোঁচানো পাড়টি লুটোচ্ছে ফরাসের একধারে—মোটা মোটা থামের মত পা দু'খানা আধগুটানো। কি ফরসা রং বাবুর—পা দু'খানাতেও যেন সোনালী রং মাখিয়ে দিয়েছে কে। ধবধবে মোটা তাকিয়ার পাশে—আর একটা তাকিয়া-পুতুল।

বস। নল সমেত হাত তুলে বাবু মিহিস্মুরে বললেন।

সবাই ঘেঁষাঘেঁষি করে এক জায়গায় বসে পড়ল। আশু তো গদির উঁচু ধার বেধে আর একটু হলেই হোঁচট খেয়ে পড়ছিল। ভাগ্যিস অধিকারী নটবর পাল ধরে ফেলল।

ব্যাপারটা বাবুর চোখ এড়াল না। বললেন, ছেলেটা কে হে? আনাড়ী আনাড়ী মনে হচ্ছে।

আজ্ঞে—আমাদের দলের কেষ্ট সাজে। ভারি চমৎকার গান করে—পাট করে। গদ্‌গদ্ হয়ে উঠলো জোড়হস্ত নটবর।

বটে! দেখি দেখি সরে আয় তো খোকা। বাবু সোজা হবার চেষ্টা করলেন। ভারি লাজুক ছেলে তো—আসরে গান গায় কেমন করে?

আজ্ঞে তা গায়। ওই তো আসরের মান রাখে। জোড়হস্ত নটবর হাসবার ভঙ্গি করল।

আরে সরেই আয় না—আমি তো বাঘ নই যে—তোকে কপ করে গিলে ফেলব! এদিকে আয় বাবা,—চেহারাখানাই দেখি। তাকিয়ার উপর ঝুঁকে পড়লেন বাবু।

নটবর পিছনে একটা চিমটি কেটে সামনের দিকে ঠেলে দিলে আশুকে। সামনের লোকগুলো সরে গেল।

বাবুর পানে একবার চেয়েই—আশুর বুকটা কেঁপে উঠল। বাঘ না হলেও মানুষের চোখে বাঘের চাউনি ফুটে ওঠে বইকি। রক্তমাংসলোলুপ বাঘের মতই বাবুর ঢুলুঢুলু লাল চোখ দু'টি সতেজ হয়ে উঠল—পুরু ঠোঁটের কোলে যেটুকু হাসি ফুটল তারও মিল রয়েছে আমিষলোলুপ দৃষ্টির সঙ্গে। অমন ধবধবে রঙ, অমন বিরাট আকৃতি—রাজার মত বেশবাস যার, তার চাউনিতেও ইতর ইতর চড়া রঙ ফুটল কেন!

বাবু মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, তুমি কেষ্টর পার্ট কর? মানভঞ্জনের গান গাও? বলি মানভঞ্জন কাকে বলে জান? হা-হা-হা। হাসতে হাসতে তাকিয়ার উপর গড়িয়ে পড়লেন বাবু।

সে হাসির প্রতিধ্বনি তুলল পারিষদবর্গ।

টেনে টেনে বহুক্ষণ ধরে হাসলেন বাবু। পাশবালিশের তলা থেকে একটা চৌকো ভেলভেটের ছোট কেস উঠিয়ে সেটা খুলে ফেললেন। ভিতরে ফুলের আকৃতি একটি জিনিস চক্‌চক্‌ করে উঠল।

বাবু বললেন, সোনার মেডেল এটা। যে সব চেয়ে ভাল গাইবে তাকেই দেব।

আশুর চোখ দু'টোতেও সোনার কষ ধরে গেল। মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে রইল ক্ষুদ্রাকৃতি কেসটির দিকে।

কেস বন্ধ করে বাবু বললেন, যাও, আসরে গিয়ে বসোগে তোমরা—পালা আরম্ভ হলে যাব। তোমাদের কেষ্টচন্দ্রটিকে দেখবার জন্যই যাব।

আশু পিছিয়ে এসে বসল।

নটবর পাল ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, যত গোমুখ্যু নিয়ে হ'য়েছে আমার কারবার! বাবুকে একটা প্রণাম করে আসতেও পারলি নে! তোর ওপর নজর পড়েছে বাবুর—দলটার আখের যাতে ভাল হয়—দেখতে হবে তো।

কথাটা বার বার ঘা মারতে লাগল আশুর বুকে। এখনও মনে হলে হৃদকম্প হয়।

আসরে নেমে ভয় সঙ্কোচ দ্বিধা কেটে গেল—প্রাণ খুলে গাইলে আশু।

একটা ফুলকাটা রুমালে একখানা দশটাকার নোট বেঁধে বাবু ছুড়ে দিলেন কৃষ্ণবেশী আশুকে।

এবার টাকাটা নিয়ে প্রণাম করতে ভুললনা আশু।

গান শেষ হলে সাজঘরে এসে নটবর বলল, টাকাটা আমায় দে দিকি।

আশু বলল, বাঃ রে, তোমাকে দেব কেন—এ-তো আমাকে দিয়েছে বাবু।

তোকে দিয়েছে সোনার মেডেল। প্যালা যা পড়ে—দলেরই পাওনা। আইন হলো তাই। নটবর বলল।

আইনের কথা আগে তো শুনিনি—

প্যালা পড়ে—শুনিস নি? দে—টাকাটা দে। নটবর হাত বাড়ালো।

তখনও ইতস্তত করছে আশু—দেবে কি দেবেনা। এমন সময় একজন বাবু এসে ঢুকলেন সাজঘরে। বললেন, কেষ্ট সেজেছিল কোন্ ছেলেটি—তাকে বাবু একবার ডাকছেন।

আশু চাইল নটবরের দিকে। নটবর বলল, যা—দেখা করে আয়। টাকাটা—

এই নাও তোমার টাকা! টাকাটা ছুড়ে ফেলে দিলে নটবরের দিকে।

রাগ করিস কেন আশু—তোর ভালর জন্যেই চেষ্টা করি। নে—কিছু মুখে দিয়ে নে। তাড়াতাড়ি খাবারের প্লেটটা তুলে ধরল নটবর।

বাবুটি বলল, বাবুর ওখানেই খাবে—সেই ব্যবস্থা আছে। মুখটা ধুয়ে চট্ করে এস হে ছোকরা।

বেশ বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে গেল আশু। বাবু আলাদা করে ডেকেছে—সবার চেয়ে আলাদা মান আশুর। নটবর পাল দেখবে দশটা টাকার চেয়ে কত বেশী আদায় করে নিয়ে আসবে আশু।

॥ আট ॥

আত্মগৌরবের হাওয়ায় ভরে বেলুনটিকে দিব্যি উড়িয়ে এনেছিল আশু—বাবুর বিলাসগৃহে ঢুকতে না-ঢুকতে সেই বেলুন কোথায় যেন ছিদ্রবস্তু হয়ে মাটিতে নেমে এলো।

তাকিয়া চাপড়ে বাবু বললেন, বসো বসো। এক্‌সেলেণ্ট পার্ট করেছ তুমি—শহরেও এমন একটি দেখিনি। আমার কি ইচ্ছে হয়েছে জান? একটা শখের যাত্রার দল খুলবো। ওই মান-ভঞ্জনের পালা—তুমি হবে কেষ্ট। আর সত্যিকারের একটি রাধিকা এনে দেব যাকে দেখলে তোমার পার্ট আরও খুলবে। নাও, জল খাও আগে।

আড়ষ্ট হয়ে কিছু মুখে দিল আশু। বাবুর পাশেই বসেছিল। কেমন একটা গন্ধ বার হচ্ছিল বাবুর গা থেকে। ফুলের মিষ্ট গন্ধেও তার চড়া গন্ধটা ঢাকা পড়ছিল না।

বাবু লুচি পোলাও খেলেন না—তরকারি ছুঁলেন না—সন্দেশ রসগোল্লা রাবড়ি কিছুই নয়। একটা ডিসে কতকগুলো ভাজা ছিল, মাছের—মাংসের—তাই একটু একটু চাখতে লাগলেন—আর ফেনাওলা সোডা মিশিয়ে মদ।

ওটা মদই। সোনালী তার জড়ানো বোতলে 'লাল্‌চে রঙের সরবৎটা মদ ছাড়া কি! দিশী মদের মত ভক্‌ভকে গন্ধ নয়—বেশ মিষ্টি মিষ্টি আমেজ ধরানো বাস। নটবর যা খায়—তার গন্ধে গা বমি বমি করে—এ কিন্তু বমি আনে না। তাহলেও গন্ধটা ভাল নয়। কেমন আনচান করে বুকের মধ্যে। না খেয়েও ঘোর লাগে।

বাবু কাঁচের প্লেট থেকে একটা ভাজা তুলে নিয়ে বললেন, কাটলেট খাবে—বেষ্ট কাটলেট।

কাটলেটে কামড় বসিয়ে বাঁ হাত দিয়ে গ্লাসে ঢাললেন। লাল মদ—ঢাললেন সোডা। ফেনা উপচে পড়তে লাগল গেলাসে।

চেয়ে চেয়ে দেখছিল আশু। বাবু হেসে বললেন, এটা সহ্য হবে না—কড়া ধাতের মানুষ না হ'লে তলাবে না পেটে। আচ্ছা মিষ্টি সরবতের মত একটা আনাই—এলাচদানার গন্ধ। তাই বরং এক গেলাস—

না—না।. আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল আশু।

না! বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। ও হরি—তাহলে সত্যিকারের রাধার পায়ের কাছে বসে কেমন করে গাইবে ছোকরা ঃ

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়িমানমনিদনিম্।

আবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন বাবু।

আশু কাঠ হয়ে বসে রইল।

আচ্ছা, থাক আজ এই পর্যন্ত। আজকের পালা এই পর্যন্ত। বলে বাবু তরজার ঢংএ গাইলেন ঃ

এই পর্য্যন্ত হলাম ক্ষান্ত কৃষ্ণকান্তে স্মরি।
মুসলমানে বল আল্লা আল্লা হিন্দুতে বল হরি॥

ডুম-ডুম-ডুম। তাকিয়ায় গোটাকতক দ্রুত চাপড় মেরে আসর ভাঙ্গার বাজনা বাজালেন বাবু।

বাবুর কিন্তু উঠবার নাম নেই। আশুর খাওয়া হলেও পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন না। অবশেষে যে বাবুটির সঙ্গে এসেছিল আশু—তিনিই বললেন, তাহলে একে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি?

বাবু চোখ পাকিয়ে উঠলেন, হোয়াট? কোথায় পাঠাবে? সেই নরকে? নেভার—নেভার।

বাবুটি থতমত খেয়ে বলতে লাগলেন, তাহলে—তাহলে—

তাকিয়ার উপর সজোরে একটা কিল বসিয়ে বাবু বললেন, এইখানেই থাকবে ও। পাশের ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দাও—নেটের মশারি টাঙিয়ে দাও—

এই কথায় আশুর আত্মগৌরবের বেলুনটি চুপ্‌সে গেল। ও কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, আজ্ঞে সেখানে আমার কাপড় জামা—

আবার তাকিয়ায় কিল বসিয়ে বাবু গর্জ্জন করে উঠলেন, কুছ পরোয়া নেই—দর্জ্জিকে বোলাও। এক্ষুনি মাপ নিয়ে যাক। কালই জামা চাই। এক ডজন হলে হবে না? দেখ জুতোও কিনে দিয়ো কাল দু' জোড়া। এক জোড়া চটি আর সু এক জোড়া। ছাতা ছড়ি ঘড়ি ভদ্রলোকের যা যা দরকার সব কিনে দেবে কেমন? যাও।

আশুর মনে হল—ওকে বন্দী করা হ'ল। সোনার পিঞ্জরে পুরে পায়ে শিকল পরিয়ে রাজভোগ ধরে দেওয়া হল সামনে! টপ্ টপ্ করে ওর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

বাবুটি অবাক হয়ে বললেন, আরে তুমি তো ভারি বোকা ছেলে হে, কাঁদ কেন? বাবুর নজরে পড়েছ—দেখ না ঝাঁ করে কেমন উপরে উঠে যাও। তখন আমাদের কথা কিছু কিছু মনে রেখো হে।

কান্নার চোটে দু' চোখ তখন প্রায় অন্ধ, আশু ধীরে ধীরে নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকল।

কোন রকমে না ঘুমিয়ে কাটল রাত। পুরু বিছানায় শুয়ে ছিল সত্যি—আশুর মন চলে গিয়েছিল গ্রামের বাড়ীতে। ছেঁড়া চটের উপর ছেঁড়া মাদুর—শীতকালে তার উপর বড় জোর একখানা কাঁথা। মাথায় তুলোওঠা বালিশটায় তেলচিটে গন্ধ। অন্ধকার ঘরে আরশোলায় সুড়সুড়ি, ইঁদুরের কাগজ কুলো ধামা কাটার

কুটুর কুটুর শব্দ, বেরালের ঝগড়া, পিসির বাড়ী-বন্ধনের ছড়ার স্বর, এই সবের মধ্যে কি করে যে অগাধ ঘুমের রাজ্যে চলে যেত!

মনে একটু অনুশোচনা জাগছে। পিসির সঙ্গে ঝগড়া করাটা ভাল হয়নি। নটবর পাল যত মন্দ মানুষই হোক—তার দল ছেড়ে আসাটা উচিত হবে না। কিন্তু তার দলেই বা থাকবে কেন! যাত্রার দলে থেকেই তো আজ এই বিপদ! কোথাকার এক মাতাল বাবু—তার পাল্লায় পড়ে আকণ্ঠবদ্ধ হয়ে জীবন কাটাতে হবে! যাত্রার দলের সঙ্গীসাথীরা ভাল নয়—, তাহলেও আশুর সঙ্গে ওদের মনের মিলও রয়েছে খানিকটা। বিড়ি সিগরেট তামাক খাওয়া—খারাপ ঠাট্টা ইয়ারকি করা—কি এক চুমুক গেঁজে যাওয়া তালের রস জিভে ঠেকানো—ওর মধ্যে দোষের তো কিছু নেই। আর এ যে একটা দুর্দ্দান্ত মানুষের পাল্লায় পড়ে—

সারারাত কাতর মনে প্রার্থনা করল আশু, ভগবান এর থেকে আমাকে উদ্ধার কর। এই নাক মলছি—কান মলছি—গুনে গুনে চোদ্দ হাত নাকখত দেব—যাত্রার দলে আর নয়। দোহাই তোমার, সওয়া পাঁচ আনার হরিরলুট দেব—আমাকে বাঁচাও।

॥ নয় ॥

ভগবান কাতর প্রার্থনা শুনলেন না। বাবুর বাগানবাড়ীতে বন্দী হয়ে রইল আশু।

একদিন দু'দিন নয়—পুরোপুরি একটি মাস। সেই বাগানে মহলা বসল কলঙ্কভঞ্জন পালার। ভাল ভাল সব অ্যাক্টর এলো, হারমোনিয়ম ফ্লুট ডুগি তবলার সুরসঙ্গতে জমজমাট হল আসর। আশুরও সঙ্কোচ কাটল খানিকটা। ও গলা ছেড়েই গাইতে লাগল:

স্ফুরদধর সীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন চকোরম্।
প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চময়ি মানমনিদানং॥

একদিন সত্যিকারের শ্রীরাধিকাও এলো।

বাবু বললেন হেসে, কেমন হে বংশীধারী, পছন্দ হয়?

এত রূপ মেয়েছেলের হয়! সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কারের ঝলমলানি—পরণের শাড়ীখানাও জ্বলছে। আর জ্বল্ জ্বল্ করছে দু'টি চোখ! হাতের ভঙ্গিতে এক একটি ঢেউ উঠছে নদীতে—মুখের হাসি আরও একটি ছোট্ট ঢেউ কিনারে ভেঙ্গে দিয়ে কোমল আওয়াজে মিলিয়ে যাচ্ছে ঠোঁটের প্রান্তে। কি ঝক্‌ঝকে মুক্তোর সারি দাঁত, তেমনি কিন্নরকণ্ঠ! কিন্নরের গলা শোনেনি কখনও—লোকের মুখে শুনেছে।

গান থামলে সাধুবাদ উঠল ঝড়ের মত। এর সামনে কি গাইবে আশু! তবু গাইতে হলো। তেমন সুবিধা করলে পারল না

শ্রীরাধিকা হাসল। মন্দ কি—ছেলেটি বড় লাজুক।

বাবু বললেন, আসরে ওর জুড়ি নেই—তখন অন্যরূপ।

কিন্তু সেইদিন রাত্রিতে যে ঘটনাটা ঘটলো—তা কোনদিন ভুলবে না আশু।

বাবু মদের ঘোরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। দলবল সমেত শ্রীরাধিকা চলে গেছে। দু' একজন মোসাহেব যা আছে তাদের অবস্থাও বাবুর চেয়ে ভাল নয়। চাকর দরোয়ানরা সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত—যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে। একা আশুই আছে জেগে। জেগে জেগে ভাবছে—আকাশ-পাতাল ভাবছে। বাবুর দৌলতে সে-ও আজ ভদ্র হ'য়েছে। তার পরণে মিহি শান্তিপুরী ধুতি, গরদের পাঞ্জাবীতে সোনার বোতাম, পায়ে চীনেবাড়ীর দামী জুতো, হাতে সোনার ঘড়ি আংটি। ঐশ্বর্যের ছোঁয়া লেগে সে-ও হয়েছে লক্ষ্মীমন্ত। কিন্তু মনে সুখ নাই। তার স্বাধীন সত্তা গেল কোথায়? নিজের মনে গান গাওয়া—হাসা কাঁদা

চলা বলা? শুধু রাজভোগ খেতে কুকুরের মত ল্যাজ নেড়ে 'তু' ডাকে ছুটে আসা—শুধু যো হুকুম বলা—হাই তুললে তুড়ি দেয়া··· রোজই চোখের জল ফেলে আশু আর ভগবানকে ডাকে।

হঠাৎ চিন্তার সূত্র ছিন্ন হল—বাবু ডাকছেন। নেশার ঘোরেই হোক—আর জ্ঞান ফিরে পেয়েই হোক—ডাকছেন। সাড়া দেবে কে—সবাই নেশার ঘোরে অচেতন। ছুটে গেল আশু।

বাবু তখন তাকিয়া ঠেস দিয়ে উঠে বসেছেন। ওকে দেখে আরক্ত চোখ মেলে বললেন, হুইস্কি—সোডা।

আর খাবেন না। আশু মিনতি করল।

চোপরাও। জলদি—লাও।

ভয়ে ভয়ে বোতল গ্লাস এগিয়ে দিলে আশু।

বোতলের সুরা গ্লাসে না ঢেলে গলায় ঢাললেন বাবু। বোতলটা ফরাসের উপর আছড়ে ফেলে হাঁকলেন, শ্রীরাধিকা কোথায় হে বংশীধারী?

আজ্ঞে তিনি চলে গেছেন।

দুত্তোরি! বলে একটা ইংরেজী ছড়া কাটলেন বাবু।

তারপর বললেন, কাঁপছ কেন, ইদিকে এসো। শোন—

বাবুর চোখ জ্বলছে—যেমন রাত্তিরে পশুর চোখ জ্বলে।

যাব কি যাব না করে অল্প খানিকটা এগিয়েছে—বাবু ত্বরিতে তাকিয়া ঠেসানো দেহটা তুলে খপ করে ওর হাতখানা চেপে ধরলেন। টানের বেগ সইতে পারল না আশু—টলে পড়ে গেল বাবুর বুকের উপর।

হা-হা করে হেসে উঠলেন বাবু। দু'হাতে চেপে ধরলেন ওর শরীরটা। অসহ্য একটা বেদনা—অসহ্য দুর্গন্ধ—আশুর দম বন্ধ হয়ে এলো। ও প্রাণপণে ডাকতে লাগল, ভগবান—বাঁচাও আমাকে—বাঁচাও।

অজগর যেমন পাকে পাকে জড়ায় ভক্ষ্য বস্তুকে—তেমনি চাপ

সারা শরীরে, তেমনি সম্মোহ ধীরে ধীরে চেতনার শিখাটুকুকে গ্রাস করছে। জলে-ডোবা মানুষের মত আশু ভাবছে, এই বোধ-টুকু শরীর থেকে নিভে যায় যদি—জীবনের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে না কি।

ঈশ্বর শক্তি দাও—শক্তি দাও।

সমস্ত শক্তি এক করে আশু কামড় বসাল বাবুর মণিবন্ধে। বাহুবন্ধন শিথিল হ'ল—হেঁচকা টান দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আশু। তারপর একছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

॥ দশ ॥

আর মনে পড়ে না কোন্ পথ দিয়ে বাগানের বাইরে এসেছিল, ছুটেছিল কতক্ষণ। খানাখন্দ মাঠ বন কি পড়েছিল সামনে—কি ভাবে বা পার হয়েছিল একটি ক্ষীণস্রোতা নদী—কিছুই মনে নাই। মোট কথা ছুটে ছুটে চলেছিল সাম্‌নে—বাবুর হুকুম যেখানে পৌঁছবেনা—বাবুর হাত যে দূরকে ছুঁতে পারবে না, দৃষ্টির আগুন যে দিগন্তে জ্বালা ধরাবে না। পূবের আকাশে অন্ধকার পাতলা হতেই একটা বটগাছের কোলে বাঁধানো চাতালে বসে পড়েছিল। কাছেই জলের কল কল শব্দ শোনা যাচ্ছিল—বাতাস বইছিল ফুরফুর করে। অসীম ক্লান্তি সারা দেহে—বাতাস যেন মায়ের স্নেহ মাখিয়ে ওর চোখে ঘুমের বন্যা নামিয়ে আনল। চাতালে শুয়ে পড়ে চোখ বুজল আশু।

চোখ মেলতেই দেখে—রোদে সর্বাঙ্গ ভরে গেছে—সেই রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী। ভাল করে দু'হাতে কচলে নিলে চোখ। আবার চাইল। না, স্বপ্ন নয়—সত্যই দাঁড়িয়ে আছেন সন্ন্যাসী। এক হাতে জলভর্তি কমণ্ডলু—অন্য হাতে পুষ্পপাত্র।

কে তুমি বাবা, কোথা থেকে আসচ ? মিষ্টি গলায় শুধোলেন।

আমি কোথায় ? হতভম্ভের মত জিজ্ঞাসা করল আশু।

চাঁদড়ার জেলেপাড়ায়। সন্ন্যাসী বললেন।

চাঁদড়া! আশু কি স্বপ্ন দেখছে!

বলাগড়-চাঁদড়া। কিন্তু তোমার এ দশা কেন বাবা? তুমি কি পালিয়ে আসছ বাড়ী থেকে ? সন্ন্যাসী আবার শুধোলেন।

না-না। কেঁদে ফেলল আশু। আমাকে বাঁচান, দোহাই আপনার।

এস, আমার সঙ্গে আশ্রমে এস। আগে খাওয়াদাওয়া কর, বিশ্রাম নাও—পরে শুনব তোমার কথা। বললেন সাধু।

সমস্ত শুনে—উনিই গঙ্গা পারের ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন, বিপদে ভগবানকে স্মরণ করেছ—তিনিই তোমাকে পাঁক থেকে তুলে ধরেছেন। তাঁর দয়া কখনও ভুলবে না।

গায়ের জামাটা একটান দিয়ে খুলে ফেলল আশু। কান্না-ভেজা কণ্ঠে বলল, এ জামা কাপড়—সোনার বোতাম আমি নেব না। আপনি—

থাকুক। ও সবই ভগবানের দান বলে গ্রহণ কর। ওই বোতাম বেচে এমন কিছু কর যাতে সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ হয়। প্রশান্তস্বরে বললেন সাধু।

সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে খেয়া নৌকায় এ পারে এসেছিল আশু। আজও ভোলেনি সন্ন্যাসীকে। যা তিনি বলেছিলেন তাও ভোলেনি, কিন্তু সঙ্কট সময়ে ভগবানকে স্মরণ করতে পারল কই! তা যদি পারত…

ভুবনমণি বলল, আবার সেই ফড়েগিরি! উনি চিরজীবন দুঃখু সয়ে গেলেন—

আশু তখন মনস্থির করে ফেলেছে। বলল, তাহোক—এই ভাল।

কেন, যাত্রার দলে তো শুনি বেশ নামডাক হয়েছে—

না-না। আমার খুসি। নিজে স্বাধীন হয়ে থাকব—পরের এন্তেজারিতে যাব না। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে রূঢ় হয়ে উঠল আশু।

পারবি বোঝা বইতে?

পারব। লম্বা হাত দুখানা উঠিয়ে হাসল আশু। আশু আর বালক নয়—ষোলো বছরের কিশোর ছেলের দেহে প্রথম যৌবনের শক্তির জোয়ার সুরু হয়েছে।

সেই থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা সংস্থানের চেষ্টা চলছে। সৎ পথে উপার্জ্জন, কিন্তু এ পথের দু'ধারেও খানাখন্দ কাঁটা ঝোপ কম নয়। সে দুর্ভোগ এড়াতে পারল না তো আশু। সন্ন্যাসীকে ভোলেনি—তাঁর উপদেশও ভোলেনি, কিন্তু বেয়াড়া মন বেতালে পা ফেলেছে যখন—ওসব মনেও হয়নি। ঝড় উঠলে যেমন তেঁতুল-পাতা অশ্বত্থ-পাতা এক হয়ে যায়, কু-প্রবৃত্তি তেমনি সুপথ কুপথ এক করে দেয়। আশু সব ভুলে যায়। আশু ডুবে যায় অথৈ জলে।

॥ এগারো ॥

সে সব ঘটনাও বেশী করে মনে পড়ছে।

হাটের চালায় জায়গা নিয়ে প্রথমটা ঝগড়া মনান্তর মন কষাকষি হ'ল—আবার মীমাংসাও হয়ে গেল। আশু দুর্বল পক্ষ নয়, পোড়-খাওয়া ইঁটের মত শক্ত হয়েছে ওর দেহ—ওর মন।

বলল, জায়গা কি তোমাদের কেনা? যে আগে আসবে সেই আগে বসবে। তোমরাও তোলা দেবে—আমিও মিনি মাগনায় বসব না।

একজন আধবুড়ো ফড়ে ওধারে বসে বচসা শুনছিল।

বয়স হয়েছে বলে কাঁচা আনাজপাতির বোঝা বইতে পারে না। দামী ফলমূল,.দা-কাটা তামাক, হুঁকো, লেবু. পাটের দড়া—হল বা কিছু পাকা কলা,—কিংবা সামান্য সরষে ধনে লঙ্কা প্রভৃতি মসলা এই সব একটি মাচানের উপর সাজিয়ে নিয়ে বসে। বন্দোবস্তটি পাকা করেই নিয়েছে বাঁশের খুঁটির ওপর বাখারির চালি সাজিয়ে একটি মাচান তৈরি করে। নাম তার চন্দর। ফড়ে মহলে চন্দরদা—চন্দর-খুড়ো—চন্দর-মামা—চন্দুরে—যার যেমন অভিরুচি তেমন সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে।

মাচানের উপর থেকে গলা বাড়িয়ে হাঁকল সে, কে র‍্যা, কেজিয়া করে—ছেলেটি কে ?

গোপীতোষ বলে একজন জোয়ান ফড়ে বলল, তোমার প্রাণের ইয়ার অস্তার ছেলে গো চন্দর-মামা।

বটে, অস্তার ছেলে! তা ঝগড়া করছে কেন ?

করবে না--এই তো পিরথিমীর নিয়ম! গোপীতোষ হেসে উঠলো। কথায় বলেঃ

যে এলো শেষে রইতে দিল না দেশে
নাড়াকাটার ভাত বাড়সে।

ওরা যে সেই গোত্তরের।

আমার ফলগুলো একটু দেখিস তো ভাগ্নে—ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে আসি।

চন্দর নেবে গেল মাচান থেকে।

আশুর কাছে এসে বলল, হাঁরে—তুই বুঝি অস্তার ছেলে ? তা ঝগড়া করছিস কেন বাবা। বস—এইখানেই বস। ঠিকই তো, জায়গা কারো বাবাকালির কেনা নয়—যে আসবে আগে—

আশু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইল চন্দরের পানে।

চন্দর তাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে বলল, অ—তুই বুঝি

যাত্রার দলে কেষ্ট সাজতিস। আহা, অলকা-তিলকা পরে মাথায় ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে কি সোন্দরই না দেখাতো। তা সে সুখের চাকরি ছেড়ে দিলি কেন বাবা? পারবি কি মুটেগিরি—দালালগিরি? ঘাড় শক্ত হয়েছে তো—মনটা নরম নেই তো?

ওর কথা শুনে হাসি পেল আশুর।

একজন বলল, মুরুব্বি পেয়ে গেল ছোড়াটা। ওর বাবার প্রাণের ইয়ার ছিল তো—তরিয়ে দেবেই দেবে।

কে র‍্যা—লক্ষ্মীছাড়া! চোক পাকিয়ে চাইল চন্দর।

আশু বলল, আপনার নাম শুনেছি—

শুনবে বই কি বাবা—তোমার বাবার সঙ্গে এক কেলাসে পড়েছি—

ভিড়ের ভিতর থেকে আবার মন্তব্য হ'ল, টেনেছিও এক গেলাসে—

অশ্লীল একটা গাল দিয়ে—চন্দর ধেয়ে গেল ভিড়ের দিকে—সবাই হাততালি দিয়ে হেসে উঠল,—নারদ নারদ।

নারদ অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় এখানে গোলমালটা পেকে উঠল না। আশুকে চালার সেই জায়গাটিতে বসিয়ে চন্দর নিজের মাচানে ফিরে এলো।

ক্রমে আশু বুঝল—বাজারে শুধু জিনিস নিয়ে বসলেই হবে না—জিনিসের দর হাঁকতে হবে। নানা রসাল মন্তব্য ছুড়তে হবে তার সঙ্গে। প্রথমটা কেমন বাধ বাধ ঠেকতো—পরে তাও রপ্ত হয়ে গেল। শুধু রপ্ত হওয়া নয়—এই দরদস্তুর গুণাগুণ বর্ণনার মাধ্যমে বেশ একটি কৌতুক-খেলা জমে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে এই নিয়ে হাতাহাতিও হয়—আরও পাঁচজন সহকর্মীর মধ্যস্থতায় মিটে যায়।

ক্ষুদিরাম বলে একজন আনাজওয়ালা আলুবিক্রী করতো। প্রায়ই সে বাজারদর ছাড়া এক আনা কম দরই হাঁকত। তার

ডাক শুনে খরিদ্দারের ভিড় জমত। দু'রকম আলু রাখত ক্ষুদিরাম—কমদরের কথাটাই ঘোষণা করত তারস্বরে। সস্তার লোভে যারা আসত, আসল ব্যাপার জানার পর তারা অনেকেই ফিরে যেত। তবু কিছু কিছু বিক্রীও হতো। বলত ক্ষুদিরাম, সস্তার খদ্দের সবাই—একবার দোকানে ভেড়াতে পারলে জিনিস কাটানোর ভাবনা? খদ্দেরটি যখন এসে শোনে দু'রকম আলু দু'রকম দাম—তখন ভাবে, দূর ছাই, সব জায়গায় তো একই দাম—এইখান থেকেই নিয়ে ফেলি। নেয়-ও। আমার মাল কাটানো নিয়ে দরকার।

সেদিন বড় আলুগুলো ছিল পচা—ক্ষুদিরাম হাঁকছিল, নিন্ বাবু, সস্তার মাল। ছ'আনা সের।

পাশেই বসেছিল আশু—ওর ঝাঁকাতেও ছিল আলু। ভাল আলু। ও হাঁকছিল—আট আট আনা সের বাবু—আট আনা সের। দেখেশুনে নেবেন বাবু—পচায় পড়বেন না।

আশুর দোকানেই ভিড়টা জমে উঠল। আলুর রং ও চেহারা দুই ছিল ভাল।

আশু দাঁড়িপাল্লায় আলু ওজন করতে করতে অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বলতে লাগল, কম দরে আমরাও বেচতে পারি—যদি পচা মাল আনি। তখন আপনারাই গালাগাল করবেন। কথায় বলে—সস্তার তিন অবস্থা।

কথাটা কানে গেল ক্ষুদিরামের। সেদিন অনেকক্ষণ চীৎকার করেও খদ্দের জমাতে পারেনি—আলুর চেহারা দেখে সবাই সরে আসছিল আশুর দোকানের সামনে। ক্ষুদিরাম জ্বলছিল মনে মনে। একবার মন্তব্য করল, ভাল আলুর ওজনটা দেখে নেবেন বাবু।

বলে নিজের পাল্লাটা অকারণেই উঁচু করে তুলে দোলাতে লাগল।

মন্তব্যটা আশুর কানে যেতেই ও বলে উঠল, খদ্দের ঠকানো

ব্যবসা করিনা, খাঁটি দাম নেব—খাঁটি ওজন দেব—কোন শালার কথায় ধার ধারি না।

তবে রে শালা—ভারি যে তিলুনি হয়েছে দু'দিন বাজারে বসতে না বসতে! পাল্লা উঁচিয়ে তেড়ে এল ক্ষুদিরাম।।

আশুও তড়াক করে লাফিয়ে উঠল—ছোট্ট বাখারিটা হাতে করে। দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনের উপরে। তারপর হৈ-হৈ—ছুটো-পুটি হট্টগোল।

দোকানিরাই মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিল ঝগড়া—কিন্তু মন কষা-কষির জের বেশ কিছুদিন ধরে চলল। আর সে জের চালিয়ে যেতে লাগল—ভুবনমণি আর বেচাকালী।

হ্যাঁরে, তোর জামাটা এমন ফালানালা হ'ল কি করে? মুখে আঁচড়ানোর দাগ—ইস—রক্ত ঝরছে যে! কোথাও পড়ে গিয়েছিলি কি? ওই জন্যেই তো পই পই করে বলেছিলাম—ও কাজ পারবি নে—পারবি নে। ভুবনমণি হায় হায় করে উঠল।

আশু বলল, না গো না, চেঁচাচ্ছ কেন! আজ ক্ষুদের সঙ্গে একচোট হয়ে গেল বাজারে।

বলে নিজের বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করল আশু।

বেচাকালী চড়ে উঠল,—আস্পদ্দা কম নয় তো ক্ষুদে কলুর! দুধের ছেলেকে মেরে খুন করে ফেলেছে একেবারে! বাজারে কি ভদ্দরনোকেরা ছিল না—সবাই কি মরে হেজে গিছল! ওপরে ধমমো কি নেই—ক্ষুদের বউএর রাঁড় হাত হবে কবে? কবে—

আঃ, থাম পিসি! সব মিটমাট হয়ে গেছে! আশু থামাতে চাইল।

মিটমাট বললেই মিটমাট! ছেঁড়া জামাটা নতুন হবে? মুখে আঁচড়ানির দাগ থাকবে না? তুই তরকারিটা নামিয়ে নিস বউ—আমি ওর ঝাঁড়ে পা দিয়ে আসচি। দুম দুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল বেচাকালী।

সুতরাং ওরাই কিছুদিন জীইয়ে রাখলে মনান্তরটা।

এদিকে এদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল। সে-ও অদ্ভুতভাবে।

একদিন একদল সাঁওতাল-মেয়ে এক ঝাঁকা পেঁপে আর ওল মাথায় করে আনছিল বাজারে। পথেই দু'দিক থেকে দু'জনে ঝাঁকা চেপে ধরল। নামারে—কি মাল আছে দেখি।

ক্ষুদে বলল, তুই যদি নিস আশু—আমি আর দর দেই নে।

আশু বলল, তুমিই দরদস্তুর কর ক্ষুদে-দা।

তুই নিবি তো?

তোমার দরকার হয় তুমিই নাও।

না, তোকেই শিখিয়ে দিই বরং—নতুন তো—বাজারের হালচাল জানিস নে।

দর করে ঝাঁকাটা আশুকেই দিলে ক্ষুদিরাম।

আশু বলল, তোমার দস্তুরী?

রাম কহ! হেসে উঠল ক্ষুদিরাম। কাগ কখনো কাগের মাংস খায়! তবে বিড়ি থাকলে একটা দিতে পারিস।

বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল ক্ষুদিরাম, দেখ আশু—তোর পিসিটাকে এক জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারিস? বুড়ী এক একদিন এমন গাল পাড়ে—মরা মানুষেরও রাগ হয়।

আশু হেসে উঠল। ওদের স্বভাবই হ'ল কোঁদল করা। মা পিসি দুইই সমান।

ক্ষুদিরাম বলল, তা এক কাজ করনা কেন? ওই পিসিটাকে জার্মেণীর যুদ্ধে পাঠিয়ে দে। ইংরেজরা শুনছি হেরে ঢোল হয়ে যাচ্ছে—এমন দিশী গোলা পেলে—

যা বলেছিস! দু'জনেই হো-হো করে হেসে উঠল।

॥ বারো ॥

ক্ষুদিরামের সঙ্গেই ভাব জমল বেশী। ব্যবসার আরও অনেক ফন্দীফিকির শিখিয়ে দিলে ক্ষুদিরাম।

দেখ—পাল্লাটার পাষাণ ভেঙ্গে রাখবি। যেদিকে বাটখারা চাপাবি—সেই দিকে ইঁটের কুচো কি খাবড়া ভাঙ্গা কি নিদেন-পক্ষে একটা আধপচা আলু চাপিয়ে রাখবি—তা'লে বেশীর ভাগ খদ্দেরই মনে করবে পাষাণ ভাঙ্গা। অথচ এক কাঁচ্চাটাক পাষাণ রাখতেই হবে—নালে নোকসান হবে। খদ্দের তো মালের দিকে একটু ঝোঁকতা নেবেই—ফাউও চাইবে। ওজনে মেরে একটু ফাউ দিলে খদ্দের খুসি হয়,—বুঝলি ?

আশু বলল, যারা পাষাণ দেখতে চাইবে—আর পাষাণ দেখে মারমুখী হয়ে ছুটবেছুট বলবে—

ক্ষুদিরাম চোখ কুঁচকে হাসল। আরে বোকা—তারও কলকাঠি এই আঙ্গুলের মধ্যে। দড়িটায় সামান্য আঙ্গুলের চাপ দিয়ে দেখাতে পারলে ও ঝোঁকতাইটুকু থাকে না। পাল্লার নীচেয় হাঁটুর কি মালের ঠেকনো, পাল্লা দোলানো, ঝট্ করে থামিয়েই আবার দোলানো—অনেক কেরামতি শিখতে হয় ভাই—তবে এই ব্যবসায় পেটের ভাত—পরনের কাপড় !

লাভ খুব বেশী থাকে না তো ক্ষুদি-দা।

থাকবে কি করে ! চড়া দামে মাল কেনা—চড়া দামে বেচা। পচাসরা কাটাকুটো বাদ দিয়ে থাকে কি ! মাল কাটল যদি লাভ—না কাটল তো চক্ষু চড়কগাছ ! শুকোবে—পচবে—রং খারাপ হবে—জলের আছড়া মেরে কত আর খদ্দের ভোলানো যায় রে ভাই।

একটু থেমে বলল, বেশ ছিলি ভাই যাত্রার দলে—কেন যে

এ লাইনে এলি! কথায় বলে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—তোর হ'ল গিয়ে সেই গোত্তর।

নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল আশু, না ভাই—ও লাইনটা মোটেই ভাল নয়, মানুষের পদাত্থ বলে কিছুই থাকে না। গাঁজা ভাঙ্ চরস মদ মেয়েমানুষ—

তা যদি বললি—তো বলি—নেশা ভাঙ্ এ লাইনেও একটু আধটু ধরতে হয়। না ধরলে গতরে কুলিয়ে ওঠে না।

ক্ষুদিরাম কথাটা যে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে বুকের মাঝখানে বসিয়ে দেবে—এ তো স্বপ্নেও ভাবেনি আশু।

অথচ কেমন সহজেই জীবনের সঙ্কল্প কোথায় যেন তলিয়ে গেল।

এদিকের মধ্যে কালনার গঞ্জই সব চেয়ে বড়। ধান চালের পরই আলুর বাজার। এখানকার আলু আমদানি না করলে গ্রামের বাজার চালু রাখা যায় না। আলু অবশ্য কলকাতা থেকেও আসে, কিন্তু পড়তায় পোষায় না—গাড়ী ভাড়াতে অনেক পড়ে। এদিকে কালনা হ'ল কাছেই। মাত্র তিন মাইল হাঁটলেই খেয়াঘাট—ওপারে গঙ্গার উপরেই গঞ্জ। যখন খুসি গিয়ে মাল আনা যায়। শুধু আলুই আসে না—সেই সঙ্গে সুবিধামত আনাজপাতি, পাট, তামাক প্রভৃতিও আসে। তবে আলুটাই হল প্রধান। এক মণ আলু কাটাতে পারলে পারপারানি—জলখাবার বাদ দিয়েও দেড় টাকা থেকে দু'টাকার মত লাভ হয়।

প্রায় প্রতিদিনই ওরা কালনার বাজারে আসে। কালীপদ, ক্ষুদিরাম, চন্দরখুড়ো, মাস্তাজালি, রঘু, গুপী, বন্তিনাথ, পুঁটিরাম সবাই আসে দল বেঁধে। দল বেঁধে আসার সুবিধাও আছে। হাসি-গল্প-ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে পথ হাঁটার কষ্ট গায়ে লাগে না—মাথার একমণি বোঝাটা দশমণি বোঝাও হয় না। খেয়াঘাটে এসে—

ভাল করে পা ধুয়ে নেয় গঙ্গাজলে—আঁজলা পুরে গঙ্গাজল খায়। নৌকোয় বসে মাঝির কাছে হাটবাজার গ্রামমাঠের খবর নেয়, নিজেদের গ্রামের খবর দেয়। ওপারে পৌঁছে—পা চালিয়ে দেয় গঞ্জের দিকে। তারপর দর-দস্তুর—মাল কেনার ধুম। মালের জিম্বায় একজনকে বসিয়ে রেখে ময়রার দোকানে গিয়ে মিষ্টি কি তেলেভাজা কিনে খায়। পানের দোকানে পান সিগারেট বিড়ি কেনে। ট্যাকের জার্মান সিলভারের কি টিনের কৌটোতে বিড়িগুলো রেখে দেয়—পানটি মুখে ফেলে চিবোয়, বিড়ি ধরিয়ে বোঁ-বোঁ করে খানিক টানে—তারপর পোড়া বিড়িটি নিভিয়ে কানে গুঁজে রেখে বলে, চল মামু—ওঠা যাক—না'লে বাজার পাওয়া যাবে না।

এ হলো গিয়ে সকালবেলার কথা। ভোররাত্রিতে বা'র হয়ে—বেলা ন'টা দশটায় ফিরে এসে বাজারে বসা। বিকেলের হাওয়াটা অন্য রকম। এত তড়িঘড়ি ব্যাপার নয়—খানিকটা গয়ংগচ্ছ ভাব। ফেরবার তাগিদও থাকে না সবদিন—সবদিন সম্ভব হয়না ফেরা। চৈত্র থেকে ভাদ্র পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির বাধা আছে—তেমন দুর্যোগ নামলে কালনাতে রাত কাটাতেই হয়। তা কালনাতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা আছে। ভালরকম ব্যবস্থাই আছে।

সেবার বৈশাখেরই মাঝামাঝি আলু গস্ত করতে কালনায় এসেছিল আশু। সঙ্গে ছিল চন্দরখুড়ো, গুপী, বদ্যিনাথ আর পুঁটিরাম। ওরা এসেছিল বৈকালে। পরের দিন ছিল রবিবার। রবিবারের হাট বসে সকাল সকাল—খদ্দের-পত্তরও হয় তিন-চারগুণ। আগের দিন বৈকালে এসে মাল কিনে নিয়ে যাওয়াই সুবিধা।

মাল কেনা হল—সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে নামল বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে দম্‌কা হাওয়া। কাল-বৈশাখীর দুরন্ত খেলায় তোলপাড়

করতে লাগল গঙ্গা—ঢেউগুলো আপ্‌সে আপ্‌সে পড়তে লাগল কূলে।

বভিনাথ বলল, গতিক সুবিধের নয় চন্দরদা। যে হাওয়া, মাঝি খেয়া দেবে কি?

চন্দর নির্বিকারকণ্ঠে বলল, বাড়ী ফেরার জন্যে হাঁক-পাঁক করে মর্‌ছিস কেন! নাইবা ফেরা হ'ল।

আশু বলল, আমায় যে ফিরতেই হবে—মা'র জ্বর।

চন্দর বলল, দেবতার দয়া হলে অবিশ্যি ফিরব। জ্বর—তা হয়েছে কি? একটা রাতে কিছু হবে না—জ্বর-বিকার নয়তো।

পুঁটিরাম হেসে বলল, তার চেয়ে একটা ভাল আশ্রয় দেখা যাক—কি বল খুড়ো?

চন্দর বলল, সেতো বটেই। তা জানা ঘর থাকতে অন্য ঘরে যাবার দরকারই বা কি? চল সেইখেনে। মাল আজ মহাজনের গদিতেই থাক—কাল ভোরবেলায় এসে নেয়া যাবে।

একটু গা গরম করে নিলে হ'ত না খুড়ো—যে বাদলা-বিষ্টি? পুঁটিরাম বলল।

নিশ্চয়—নিশ্চয়। তা কোন্ পথে হাঁটবা গো? চন্দর বলল।

জলপথ থাকতে থলপথে পা দেবে কে খুড়ো। বেঁচে থাক আমাদের দিলু মামা। গুপী হেসে উঠল।

পুঁটিরাম বলল, তা'লে কিছু ঝাল-ফুরুলি—পেঁয়াজ-বড়া আর হাঁসের ডিমের ঝাল কিনে নেয়া যাক।

আশু বুঝতে পারল আয়োজনটা কি প্রকৃতির। বলল, আমি ওসব পরশো করব না—নাভের গুড় দেখছি পিঁপড়েতেই খাবে।

আহা-হা—দুধের বালক আমার। পুঁটিরাম ওর মুখের কাছে হাত নেড়ে গেয়ে উঠল:

সাধ যায় বোষ্টম হতে—
প্রাণ ফাটে মোচ্ছব দিতে!

সব রকম অব্যেস না থাকলে ফড়েটিগিরি করতে এসেছ কেন গোপাল!

চন্দর ওকে ধমক দিয়ে উঠল, তুই থাম পুঁটে—ও ছেলে-মানুষ—জানে কি হাল-চাল! এসো বাবা—আমাদের সঙ্গেই এসো, তোমাকে এসব কিছু খেতে হবে না—শুধু সিঙ্গাড়াকচুরি খেয়ো। হাঁসের ডিম ইচ্ছে হলে খেয়ো—থলপথেই ধূমযাত্রা করো—যা তোমার প্রাণ চায় বাবা।

না, আমি যাব না। আশু মাথা নাড়ল।

যাবা না তো রাত কাটাবা কোথায়? অজানা জায়গা, চোর বদমাইসও কম নেই এখানে। ট্যাঁকে কিছু রয়েছেও—ও দুর্মতি করো না বাবা—সঙ্গে এসো।

দুর্মতি নয় সেটা, সদ্‌বুদ্ধিরই ইচ্ছা দিয়েছিলেন ভগবান। দুর্মতি জাগল সঙ্গে এসে। মানুষের সঙ্গ মানুষকে উপরে তোলে। রসাতলেও নিয়ে যায়।

একসঙ্গেই শুঁড়ির দোকানের বেঞ্চিতে এসে বসল সবাই। কাউকেই কিছু বলতে হল না।

মাথাগুনে গ্লাস হিসেব করে দিল দিলু সা। এরা অত্যন্ত জানা-চেনা মানুষ। কোন জিনিসে এদের রুচি, কি পরিমাণ পানীয় প্রয়োজন সবই মুখস্ত দিলু সা'র।

গ্লাস ভর্তি করে একে একে সবাইএর হাতে তুলে দিতে লাগল দোকানের চাকরটা।

আশু হাত গুটিয়ে বলল, চাইনে।

কাউণ্টারের মধ্যে দিলুসা'র দৃষ্টি বিস্ফারিত হল। 'কি গো চন্দরখুড়ো, নিরিমিষ ছোকরা বুঝি তোমাদের দলের নয়?

চন্দর গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, আমাদেরই আত্মীয়। নতুন কিনা—আমরাও গুরুজন রয়েছি সামনে—

দিলুসা বলল, এ জিনিস পেটে পড়লে সবই যে শ্রীক্ষেত্র

বাবা,—লঘুগুরু সব একাকার। নাও—ঢুক করে খেয়ে ফেল তো। গায়ে তাকৎ হবে। আচ্ছা, ও গ্লাসের দাম দিতে হবে না তোমাকে, ওটা আমারই শুভেচ্ছা।

চন্দর চোখ টিপে বলল, নিয়ে নে ভাইপো—নিয়ে নে। খাস না খাস হাত বাড়িয়ে নে তো। খাবার লোকের অভাব আছে কি! আরে এমন বোকা দেখিনি তো? মিনি পয়সায় বিষ পেলে মানুষ খায়—এতো অমত্ত। যতটুকু খাবি—ততটুকু রক্ত।

পুঁটিরাম বলল, আর কেঁড়েলি করিস কেন মাইরি! যাত্রার দলে ছিলি, সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছিস—খাঁটির খবর রাখিসনে এমনই ন্যাকা কি না!

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। এ জিনিসের স্বাদ জানে আশু। জানে এ জিনিস পেটে পড়লে পৃথিবীর চেহারা বদলে যায়—মন-মেজাজ বদলে যায়। অকারণ খুসির ঢেউ তীর থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তরঙ্গের কোলে। তাতে আনন্দ আছে, ভয়ও আছে। ও পথে আর যাবে না বলেই একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল।

একটা ঝড়ের ঝাপটা ভেজানো ছু'য়ারটা খুলে দিল। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে একরাশ বৃষ্টির ছাঁট গায়ে এসে লাগল। আশু বসেছিল দুয়োরগোড়ায়—পিছন ফিরে। ওর পিছনদিকের জামা জলে ভিজে সপসপে হয়ে উঠল।

আশুর হাতে গ্লাসটা দিয়ে চাকরটা ছুটে এসে দুয়োর বন্ধ করে দিলে।

এ হে-হে—সব ভিজে একসা! এক পাত্তরে তো গা তাতবে না মামা—আর এক পাত্তর হুকুম হোক। পুঁটিরাম হি হি করে হেসে উঠল।

আশুর সর্বাঙ্গে কাঁপুনির ঢেউ খেলে গেল। গ্লাসটা তখনও ওর হাতে ধরা। বুক পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পেলে খেয়ে বাঁচত।

ইতিমধ্যে ওদের হাতে দ্বিতীয় পাত্র এসে পোঁছল। সে পাত্রও শেষ হলো। তখনও গ্লাসটি ধরে আছে আশু।

সুরার ক্রিয়া আরম্ভ হতেই চন্দর বলল, কি বাবা—এখনও লক্ষ্মণের ফল ধরে আছ? খেয়ে নাও—খেয়ে নাও—ও সুরা নয় বাবা—সুধা। যা ভিজেছ—না খেলে নিঘ্‌ঘাৎ নিমুনিয়া। চন্দর গান গেয়ে উঠল:

সুরা পান করি না আমি—সুধা খাই জয় কালী বলে।

আমার মন-মাতালে মাতাল করে—মদ-মাতালে মাতাল বলে॥

সকলের অট্টহাসিতে ঘরখানা কেঁপে উঠল—আশুর শিরায় শিরায় ঠাণ্ডা বরফের স্রোত বইতে লাগল। দারুণ পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে—পুরাতন অভ্যাসের আমেজে পুরাতন প্রতিজ্ঞার গ্রন্থিটি কখন শিথিল হয়েছে। বাইরে বৃষ্টির মাতামাতি দাপাদাপি—শীত-জর্জরিত দেহের অণু-পরমাণুতে উষ্ণ পানীয়ের পিপাসা। আশু জ্ঞানই হারালে বুঝি। গ্লাসটি তুলে ধরল মুখের কাছে।

জ্ঞান ফিরে এলো—ছোট একটি ঘরে—ক্ষুদ্র একটি শয্যার উপরে। ঘরের এক কোণে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন; তার লালচে আলোয় স্বপ্নপুরীর মত দেখাচ্ছে সবকিছু। জানলার একধারে একটা জলের কুঁজো- একটি কাঁচের গ্লাস—তার পাশে কাঁচের ডিস্‌সে কয়েকটা ভাজাভুজি। সেইখানেই অন্যধারে একটি বোতল আর একগাছি মল্লিকার মালা। ফুলের গন্ধে ঘরখানি ম—ম করছে। সেইসঙ্গে সুরার গন্ধও মিশেছে। গা বমি-বমি ভাবটা নেই—গায়ের মধ্যে জ্বালা করছে। একটু আগে ঠাণ্ডা বরফের স্রোত চলছিল শিরায় শিরায়—এখন আগুনের স্রোত বইছে। দেওয়ালে একটা সস্তা দামের ছবি—একটি মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বাঁয়া তবলা বাজাচ্ছে। নাকে মস্তবড় এক ফাঁদি

নথ—লাল টুকটুকে পুরু ঠোঁট। হাসি তো নয়—রক্ত-চুষে-খাওয়া রাক্ষসী-ভঙ্গী একটা। গঞ্জের বাজারের একধারে এরাও দেহের দোকান সাজিয়ে বসে—পানের দোকানে এমনি ছবি হামেশাই চোখে পড়ে।

খাট নয়, তক্তাপোষেই একটি পুরুমত বিছানা পাতা, একখানা ফরসা চাদর পরিপাটি করে বিছানো। গোটা দুই ধবধবে তাকিয়া তার উপরে। মাথার শিয়রেও একমুঠো বেল-ফুল। এত ফুল এত গন্ধ···কেমন আনচান করে উঠছে প্রাণ। এ কোথায় এসেছে আশু? সঙ্গীরাই বা গেল কোথায়?

বিছানায় উঠে বসেছে—ছোট দুয়োরটি খুলে গেল। একটি মাজা-মাজা রংএর মেয়ে—ওরই সমবয়সী মেয়ে, ঘরে এসে ঢুকল। বেশ পরিপাটী করে বাঁধা চুল—চুলের পাতায় ঢেকেছে আধখানা কপাল। কপালে একটি জ্বলজ্বলে কাঁচপোকার টিপ, পানের রসে ঠোঁট দু'খানি রসালো, চোখ বড় নয়—টানা নয় অথচ আবেশ জড়ানো। গলায় সরু হার একগাছি—নাকে একটি নাকছাবি। কানে সেকালের পারসী মাক্ড়ি। হাত তুলতেই সোনা-রঙের কাঁচের চুড়ি ক'গাছা ঠুনঠুন করে বাজল। মেয়েটি এগিয়ে এলো বিছানার কাছে।

আশু অবাক হয়ে দেখছিল মেয়েটিকে।

মেয়েটি ফিক্ করে হেসে ফেলল।

বাইরে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে—আশুর বুকে থামেনি। শিরায় শিরায় তরল অগ্নিস্রোত—দম বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে।

উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস বইছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে আশু জিজ্ঞাসা করল, কে—কে তুমি?

মেয়েটি আরও কাছে সরে এলো। একখানি নরম হাত আশুর বুকের উপর রেখে তেমনি মিষ্টি হেসে বলল, আমার নাম ডালিম।

দ্বিতীয়বার জ্ঞান হারাল আশু।

॥ তেরো ॥

ক্ষুদিরামের বাড়ীতে ধেয়ে এলো বেচাকালী।

হাঁরে ক্ষুদে—কি আক্কেল তোদের বল দিকি! নিজেরা তো গোল্লায় গিয়েছিস– আবার ওই দুধের ছোঁড়াটাকেও গোয়ালে পুরলি!

ক্ষুদিরাম বলল, দোহাই পিসি, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে। কাঁল্লায় যাইনি দু'মাস—কলকাতায় মাল চালান দিচ্ছি—মাল আনছি কলকাতা থেকে। ওই পুঁটিরাম আর চন্দর-দা।

চন্দর! ওই তিনকেলে ঘাটের মড়া বুড়ো মিনসে সিং ভেঙে মিশেছে বাছুরের দলে! সবই তো জানিস ক্ষুদে—অন্তাকে গোল্লায় দিয়েছিল ওই ভড়ড্যাকরা মিনসে। আবার তার ছেলের বয়সী···ছি-ছি-ছি, দড়ি জোটে না চন্দুরের!

ক্ষুদিরাম বলল, ওই জন্যেই তো ওদের সঙ্গে আমার পটে না পিসি। আমি দুঃখুধান্দা করি যাই করি—নিজের সংসার প্রিতি পালন করি—মদ খেয়ে ফুর্তি করে টাকা ওড়াই নে বলে ওরা কত ঠাট্টা করে!

দাঁড়া—চন্দরের বাড়ী গিয়ে ওর ফাঁড়ে পা দিয়ে আসছি!

ক্ষুদিরাম বলল, ওর পেটে পা দিলে কি আশুর মনমতি ফিরবে! তার চেয়ে আশুকে ভাল করে বোঝাও গে পিসি।

বেচাকালী রোয়াকে বসে পড়ল। বলল, কত বুঝিয়েছি। আমি বুঝিয়েছি— বউ বুঝিয়েছে—মাথার দিব্যি ঠাকুরের দিব্যি, কিন্তু চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনী! উল্টে কি করেছে শত্তুর—জানিস? বোয়ের কানের মাকড়ি ছিল বাকসোয় তোলা—বাকসো না ভেঙে···বলতে বলতে গলা ধরে এলো বেচাকালীর। দু'চোখের জল ছাপিয়ে গাল বেয়ে পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি আঁচলটা

চেপে ধরে বললে, আমার এ ডুপুনি কেন বলতো ক্ষুদে! ছিলাম শ্বশুরবাড়ীতে—তাদের রাজার সংসার। চারটে মরাই, আট দশটি গাইগরু ক্ষেত খামার পুকুর বাগান মুনিষ চাকর। রাজার হালে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাও আর হুকুম কর। আমি কেন মরতে ভেয়ের সংসারে ছাতা ধরতে এলাম রে। ভাই যত-দিন বেঁচে ছিল আষ্টেপিষ্টে ভাজা-ভাজা করল—আবার হাতে করে মানুষ করলাম যে কাঁটাটাকে সেও হল শত্তুর! সব্বস্ব খুইয়ে আজ আমি ভিখিরি—ওর সাত ঝাঁটা আর নাতি খেয়ে নেড়ি কুকুরের মত ভেয়ের সংসারে পড়ে আছি! ওরে এমন দুম্মতি আমার কেন হল রে—

রোয়াকে পা ছড়িয়ে বসে মড়াকান্না জুড়ে দিল বেচাকালী।

ক্ষুদিরামের বউ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, চুপ কর ঠাকুরঝি, চুপ কর। সবই কম্মফল।

বেচাকালী ঝেঁজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, কম্মফল! কেন—কি মন্দ কম্ম করেছি যে ভগমান এমনি করে শাস্তি দিচ্ছে? পোড়ার-মুখো একচোখো ভগমান। আমি কি কারু কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিইছি? কারু বাড়া ভাতে ছাই দিইছি? কারু সংসার ভেঙে দু'খান করেছি—না কারু ভাতারকে ভুলিয়ে নিইছি নষ্ট-দুষ্টু মেয়েদের মত?

ক্ষুদিরাম বলল, না পিসি—তোমার অতি বড় শত্তুরও একথা বলবে না—গাঁয়ে তোমার মত চরিত্রির ··

বেচাকালী উঠে দাঁড়াল। বলল, তবে ভগমান এমন করে দগ্ধে দগ্ধে মারছে কেন বলতে পারিস?

ক্ষুদিরামের কাছে সরে এসে গলা নামিয়ে বলল, দুঃখের কথা বলব কি ক্ষুদে—ঘরে রাংরত্তি রাখবার জো নেই। কোথা থেকে এসে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, নিজের উপাজ্জন তো মাথায় উঠেছে—আমরা দুঃখু-ধান্দা করে যে কিছু রাখব—তা-ও বাদ

সাধবে শত্তুর। সেই বোতামগুনো গেছে, বোয়ের মাকড়ি গেছে। একখানা ভাল চেলি গেছে। আর একটা সিলে আংটি ছিল—রেখেছিলাম কুলুঙ্গির গত্তের মধ্যে—তাও নেই। বাড়ী আসে শুধু উটকে-পাটকে দেখবে কোথায় কি আছে। পেটের মধ্যে জিনিস থুয়ে শান্তি নেইরে ক্ষুদে!

আচ্ছা, আমি ওকে আর একবার বলে দেখব। তবে কি জান পিসি, বয়েসকাল—নেশাটা তো ছাড়বে বলে মনে হয় না। আগে ঘা খাক—মাটি পুড়ুক—তবে তো শক্ত হবে।

বেচাকালীর মনের জ্বালা কমলো না—ধেয়ে এলো চন্দরের বাড়ী, কই ভাগাড় কোথায়? অলপ্পেয়ে ড্যাকরা যমের অরুচি গেল কোথায়?

চন্দরের বউ বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দ্বিতীয়পক্ষের বউ—বয়স কম, সুন্দরীও। এদের ঘরে এমন ফরসা রঙের মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। সকালবেলা হ'লেও পান চিবুচ্ছে। পানের রসে ঠোঁট দুখানি টুকটুকে লাল, কপালে একটা লাল সিঁদুরের টিপ—ফরসা কালাপাড় কাপড়খানি গুছিয়ে পরা। গলায় হালফ্যাসানের একগাছি হার। হাতে বরফি চুড়ির গোছা। রান্নাঘরে কাজ করছিল না তো—বাসর ঘরে সেজেগুজে বসে বরের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ারকি দিচ্ছিল যেন!

তেমনি হেসেই বলল, কি গো ঠাকুরঝি---কি মনে করে? আজ যে পূবের সূয্যি পশ্চিমে উদয়।

বেচাকালী আপনমনে বলল, মরণ—তিন পেরতঃতকালে খ্যামটাউলিদের মত ভাবন দেখ! ছেনালের দশাই হল আলাদা! প্রকাশ্যে বলল, আসতে হল নিজের গরজে। কথায় বলে গরজ বড় বালাই! তা চন্দুরে কোথায়?

কাল কালনায় গিয়েছে—এখনও ফেরেনি।

এই কথায় জ্বলে উঠল বেচাকালী। তা ফিরবে কেন—

পরের ছেলের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে—ফুর্তি করছে আমোদ করছে—ফিরবে কেন ?

চন্দরের বউ রতনমণি বলল, তা ওনাকে দুষছ কেন ঠাকুরঝি ? তোমাদের ছেলে তো কচি খোকাটি নয় যে কুলোয় শুয়ে তুলোর পলতেয় দুধ খাচ্ছে।

কি—কি বল্লি ? গর্জ্জে উঠল বেচাকালী।

ঠিকই বললাম। নিজের ঘর সামাল দাওগে ঠাকুরঝি—পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সাধু হয়ো না ! বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

ক্ষেপে উঠল বেচাকালী। ওরে আমার সতী নক্ষীরে !—মুখ নাড়তে নজ্জা করে না। তোদের রীতব্যাভার গাঁয়ের কোন লোকটা না জানে ! তোরা মাগভাতারে গাঁখানাকে গোল্লায় দিচ্ছিস নে ? তোর ঘরে যত রাজ্যের বয়াটে ছেলের হুল্লোড় ! ঘর নয় তো বিন্দাবন ! তা ঘরে তো অনেক নীলাখেলা হয়েছে—এবার বাজারে গিয়ে দোকান খুলে বসগে—আরও গয়না হবে—কাপড় হবে—টাকা হবে—

পথে লোক জমে গেল মজা দেখবার জন্য।

॥ চোদ্দ ॥

পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া করে গাল দিয়ে দুঃখ জানিয়ে বেড়ালে মনের জ্বালা খানিকক্ষণের জন্য মেটে বটে—সর্ব্বক্ষণ যে হু হু করে মন। আবার ধান ভানা ঠোঙা তৈরী করা মশলা কোটা আরম্ভ করলে বেচাকালী। ভুবনমণি—মুখুজ্জেবাড়ির কাজ নিলে। আশুর উপার্জ্জন হওয়াতে মিত্রবাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছিল সে। কে জানত—ছেলের উপার্জ্জনেও মায়ের দাস্যবৃত্তি ঘুচবে না !

ভুবনমণি আর ঝগড়া করে না, কাঁদে না, দুঃখুও করে না।

কেমন যেন মন-গোঁজা মানুষের মত চুপচাপ থাকে। কথাও বলে কম।

বেঁচোকালী বলে, তুই খানিক কাঁদ বউ—বুকটা হাল্কা হয়ে যাক।

ভুবনমণি বলে, কান্না যে আসে না ঠাকুরঝি।

তাই বলে দিনরাত ভাববি ওই শত্তুরের কথা?

ভাবি না তো।

তবে শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন দিন দিন? কেন হাতে-ভাতে করিস, কালো কাপড়ে থাকিস, সন্ধ্যে উতরে গেলে পিদিম জ্বালিস নে—শাঁক বাজাস নে— দুয়োরে গঙ্গাজল দিস নে? পূজোপাব্বণ বার-বত্ত সবই তো উঠিয়ে দিয়েছিস বউ!

আমার আর সংসার কিসের ঠাকুরঝি! জীবনভোর জ্বললাম—খুব সুখ ভোগ করলাম—আর সাধ যায় না কিছু করতে! নিঃশ্বাস ফেলল ভুবনমণি।

ওমা, তোর সংসার নয় তো সংসার কি আমার! কথায় বলে, না ভাতার না পুত—বেড়ায় যেন যমের দূত! আমি তো যমের দূত হয়ে বেড়াচ্ছি। খাচ্ছি-দাচ্ছি—গতর বাড়ছে—কোন্ উব্‌গারে লাগছি মানুষের! নে ওঠ, কাল আরান্দ—, রান্নাবান্না কর। আমি কচুর শাক কেটে আনছি—চাল্‌দে ছাঁচি কুমড়োর জোগাড় করছি—মটর-ডাল ভিজিয়ে দিচ্ছি। তুই পুকুরে একটা ডুব দিয়ে নেয়েধুয়ে এসে রান্না চড়িয়ে দে। তোর হাতের কচুর শাক কতকাল যে খাই নি!

সারা বিকেল ধরে রান্না করল ভুবনমণি। রান্না করে হেঁসেলের একধারে তুলে রাখল। পাঁচ রকম ভাজা, কচুর শাক, মটরডাল-ডালের বড়া আর চালতার অম্বল। রান্না করে অন্যমনস্ক হওয়ার যো কি—চোখের জল গড়াতে লাগল হু হু করে।

বেচাকালী বলল, পূজোর যোগাড়টা সেরে রাখি—একটা

সিজ মনসার ডাল এনে রাখি—হারু ভসচাজ্জিকে বলে আসি কাল যেন একটা ফুল ফেলে দিয়ে যায় মা মনসার মাথায়! একটু কাঁচা দুধ আর একটা পাকা কলা চাই। কাল মনে করিয়ে দিস বউ।

আলো নিভিয়ে সন্ধ্যাবেলাতেই শুয়ে পড়ল দু'জনে। ভুবনমণির চোখে ঘুম আসছে না—বেচাকালীও জেগে। পাশ ফেরার শব্দ—উস্‌খুস্‌ করার শব্দ—বাইরে টুপ করে পাতা পড়ার শব্দ—গাছের ডালে পাখীর পাখা ঝাপটানির শব্দ···সারা গ্রামখানি বুঝি শব্দময় হয়ে উঠল। মনের মাঝেও শব্দ উঠছে কি কম! বুকটা ধুক ধুক করছে—ভাদ্রের গুমোটে গাছের পাতাটিও নড়ছে না। তবু দাওয়ায় কিসের যেন সাবধানে চলার শব্দ।

ভুবনমণি একবার কাসল—প্রত্যুত্তরে বেচাকালীও কাসল। দু'জনেই বুঝল—একই চিন্তার চিতায় দু'জনের অন্তর পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

ভুবনমণি ডাকল, ঠাকুরঝি, জেগে আছ?

বেচাকালী বলল, হুঁ।

একটা কথা বলে রাখি শোন।

এখন ঘুমো বউ—কাল শুনবো।

কাল যদি মরে যাই? ভুবনমণি ধরা গলায় বলল।

ষাট ষাট—ও কি অলুক্ষুনে কথা। বেচাকালীর গলার স্বরও ভিজে।

ভুবনমণি নিঃশব্দে হাসল। বলল, ঠাকুরঝি—মরণের কথা কিছুই বলা যায় না। ভুলেও যেতে পারি। এইবেলা শুনে রাখ। তুমি তো জানই—মহাদেবের দুয়োর ধরে রাশুকে কোলে পাই।

ওমা, তা আর জানিনে! নীলের উপোস দিয়ে হাক্লান্ত হয়ে ঢুল এসেছিল বৈকেলে। সেই ঘোরে ঘোরে দেখলি একজন পুরুষ মানুষ, সাদা ধবধব করছে রং—কানে ধুতরোর ফুল, হাতে তিরশূল—তোকে যেন বলছে—আমি এসেছি রে—বসবার জায়গা দে।

হাঁ ঠাকুরঝি, সপষ্ট দেখেছিলাম ওনাকে—মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। একটু থেমে বললে, তারপরেই রাশু পেটে এলো।

বেচাকালী বললে, ঠাকুরের দোর-ধরা বলে ওর নাম রাখলাম রাশু। নীলের উপোস করছিস সেই থেকে।

নীলের উপোস সব মেয়েই করে ঠাকুরঝি—মানত শোধ দেয়া হল কই! ঠাকুরের চরণে তুষী হয়ে রইলাম।

মানত আবার কি।

মানত করেছিলাম ঠাকুরঝি—রাশুকে বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখ ঠাকুর, ওকে দিয়ে সন্ন্যাস নেয়াবো। ষোল বছরে পড়বে যখন রাশু—সন্ন্যেসী হবে। তা হল কই ঠাকুরঝি! ঠাকুর ওর এমন মতিগতি দিলেন—ও যে মানত শোধ দেবে সে ভরসা নেই!

নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল ভুবনমণি। অনেকক্ষণ চুপচাপ। অনেকক্ষণ পরে বেচাকালী বলল, তা কি বলবি যেন বলছিলি?

হাঁ, ওর এক কুড়ি বয়েস পার হয়ে গেল—মানত শোধ হল না, তাই বুঝি ঠাকুর আমাকে এই সাজা দিচ্ছেন! ধরা গলায় বলল ভুবনমণি।

বেচাকালী বুঝল ভুবনমণি কাঁদছে। ভাবল, আহা, খানিক কাঁদুক—কেঁদে কেঁদে বুকটা হাল্কা হোক তবু!

ভুবনমণি বলল, তাই বলছিলাম—আমার তো দিন ফুরিয়ে এলো—ঠাকুরের দুয়োরে তুষী হয়ে রইলাম। যদি কোনদিন ওর মতিগতি ফেরে—তুমি ওকে সন্ন্যেসী করে বাবার মানত শোধ দিও ঠাকুরঝি, না'লে জীবনে কোনদিন শান্তি পাবে না রাশু।

আচ্ছা—আচ্ছা—তাই দেব—তুই ঘুমো এখন।

আর একটা কথা। রাশুর বিয়ে দিয়ে ওকে সংসারী করো ঠাকুরঝি। একটি ভালঘরের মেয়ে এনো—কর্ম্মিষ্ঠে মেয়ে। মাজা-মাজা রং হবে—টিকলো নাক হবে—দুগ্‌গে ঠাকরুণের মত

চোখ হবে—একঢাল চুল থাকবে—মাঝারি গড়নের মেয়ে। দেখো গায়ে যেন রোঁয়া না থাকে—কপাল না উঁচু হয়—খড়মপেয়ে না হয়—-এসব মেয়ের লক্ষণ নাকি ভাল নয়। আমার বিয়ের চেলিটা তো বিক্রী করে দিয়েছে—একখানা চেলি কিনে দিও। সেই চেলি পরিয়ে বরণ করে ঘরে তুলো। দুধে-আলতায় পা দিয়ে যেন ঘরে ওঠে—একটা ভ্যাদা মাছ দিও ওর হাতে—বউ ঠাণ্ডা হবে।

বেচাকালী বলল, না বউ, ভ্যাদা মাছ হাতে দেব না—ও দিলে বউ ম্যাদা হয়। আশু যেমন হাঁড়ী—তেমনি সরা আনব। মুখ ঢেকে রাখলে হাঁড়ীর ভেতরে পোকামাকড় ঢুকতে পারবে না।

তা যা খুসী করো ঠাকুরঝি—আমার হয়ে তুমিই বোয়ের মুখ দেখো। মুখ-দেখানি বলে কানের মাকড়ি দুটো রেখেছিলাম—তা সে তো ঘুচে গেল। এক ছড়া চিক আছে—লুকিয়ে রেখেছি। উই যে পাশ বালিশটা মাচানে তোলা রয়েছে—ওরই মধ্যে আছে। ও সব গহনার তো চলন নেই আজকাল। ভেঙ্গে গড়িয়ে দিও একটা হার। আজকাল যেমন হার উঠেছে না—সেই রকম।

তা হাঁ বউ—সবই তো বললি আমাকে—আমি যদি তোর আগে মরে যাই।

না ঠাকুরঝি—আমার মন বলছে—রাশুর সংসার গুছিয়ে দেবে তুমি। তুমি সতীকন্যে—সতী—তোমা হতেই ওর সংসার বজায় থাকবে।

এই কথায় বেচাকালীর চোখও জলে ভরে উঠল। কেমন একটা দুর্নিবার কান্নার স্রোত বুক ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। মুখে আঁচলটা চেপে ফোঁপানির শব্দ চাপতে চেষ্টা করল বেচাকালী।

কি ঠাকুরঝি—কথা কইছ না যে?

রুদ্ধকণ্ঠে বেচাকালী বলল, তাই হবে বউ—তোর সাধ পূন্ন হবে।

॥ পনেরো ॥

এইটুকু বয়সে অনেক নেশাই করেছে আশু—বিড়ি সিগারেট তামাক থেকে সিদ্ধি গাঁজা মদ পর্যন্ত। আফিংটা শুধু ধরেনি। ও নাকি বুড়ো বয়সের নেশা। কিন্তু এসব নেশারও পার আছে। একবার ধরলে ছাড়া কঠিন নয়। মন উস্‌খুস করে নেশার সময়টাতে, সেই সময়টুকু পেরুলে—কোন অস্বস্তি নাই। কিন্তু মানুষের নেশা—মানুষকে ভাললাগার নেশা—এর ঘোর চোখে লাগল যদি—ছুনিয়ার রং পালটে গেল অমনি। আজন্মের স্নেহ মমতা, পাপপুণ্যবোধ, পরিণামচিন্তা, হিত উপদেশ কোথায় তলিয়ে যায়। নেশার প্রথমক্ষণে যারা সহায় হয়েছিল—তারাও অবাক হয়ে গেল। এ কি ছুর্বারগতিতে পাতালের দিকে নামছে আশু!

পুঁটিরাম বলল, ভাইপো, বাড়ী যাবা না?

আশু হেসে বলল, এই তো বাড়ী।

পুঁটিরাম বলল, ডালিম তো বিয়ে-করা বউ নয় তোমার। টাকা দিতে না পারলে হতছেদ্দা পাবে।

আশু বলল, কুছপরোয়া নেহি, রূপেয়া দেঙ্গে!

চন্দর বলল, ভাইপো বাঁশভোর জলে [illegible] পড়েছে পুঁটে, দিনকতক হাত পা ছুঁড়ুক—আপনিই ফিরে আসবে।

এ কিন্তু ভাল করলে না চন্দর-খুড়ো। আমরা বিয়ে করেছি—ছেলেপুলে হয়েছে—সখ করে একআধদিন ফুর্তি-আমোদ করি আলাদা কথা, ওটাকে জলে ঠেলে দিয়ে ভাল করনি। বৈদ্যনাথ বলল।

জলে কেউ কাউকে ঠেলে দেয় না ভাইপো, এক একটা ছেলে জল ভালবাসে। জল দেখলেই তারা ঝাঁপাই ঝুড়বেই। বাদুলে-

পোকা যে আগুন দেখলে পুড়ে মরে—কেউ ঠেকাতে পারে তাকে! চন্দর গম্ভীরভাবে বলল।

তবু আমাদের চেষ্টাচরিত্তির করা দরকার। দোষটা পড়বে আমাদেরই ঘাড়ে। পুঁটিরাম বলল।

দোষ কি পড়ছে না? ওর সেই খাণ্ডার পিসিটা আমার বাড়ী গিয়ে যাচ্ছেতাই করে এসেছে। বউ কেঁদেকেটে একশা করছে। বলছে, তোমার এখানে থাকব না আর।

মুচকি হেসে বলাই বলল, থাকবেও না বেশীদিন! একটু সাবধান হয়ো খুড়ো। মেলাই ভাইপো আজকাল আড্ডা দিতে যায় তোমার বাড়ীতে।

চন্দর ঝেঁজে উঠল, তুই থাম বলা, খুড়োর বাড়ীতে আড্ডা জমাবে না তো মাঠে মাঠে ঘুরবে নাকি ওরা!

না তাই বলছি! বলাই শব্দ করে হাসল। ওদের ঘরে তুলে তুমি যদি মাঠে চরে বেড়াও সেটাই কি দেখতে শুনতে ভাল হয়!

চন্দর অশ্রাব্য একটা গাল দিয়ে উঠল। পুঁটিরাম কালীপদ বৈদ্যনাথ এরা থামিয়ে দিল ঝগড়াটা।

এসো খুড়ো একহাত গ্রাবু খেলা যাক। তুমি তো গ্রাবু ছাড়া অন্য কিছু জান না।

বাজী রেখে খেলিস যদি রাজী—না হলে কেটে পড় বাবা।

আমাদের হল পুঁটিমাছের প্রাণ, দু'চার আনার বাজী। সন্দেশ রসগোল্লার ঠোঙা আসবে না—বড়জোর তেলেভাজা ফুলুরি-বেগুনি আর জিলিপি।

আজকাল কালনার বাজারেই আনাজপাতি নিয়ে বসছে আশু।

মনের নেশা জমিয়ে রাখতে দেহেও অন্নবস্ত্রের রসদ জোগাতে হয়। ক্ষুধা হল দুনিয়ার সব চেয়ে বড় জিনিস—ক্ষুধার পথেই

জীবনের পদধ্বনি স্পষ্ট হয়? ক্ষুধা কোন্‌টি নয়? চাঁদ-ধরার অবোধ বায়না থেকে ঈশ্বর-লাভের কঠিন সাধনা পর্যন্ত। কখনো দেহ কখনো মন তারই তাড়নায় অধীর হয়ে ওঠে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কালটাতেই ক্ষুধার রাজত্ব। একটা মিটলে আর একটাতে দৃষ্টি পড়ে—একটা পেয়ে আর একটাতে হাত বাড়ানো।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলল এই নেশা। আশুর সে কোমল কান্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। কেষ্ট-সাজা সেই গোলগাল পুরন্ত মুখ—ডাগর দু'টি ভাসন্ত চোখ—কোঁকড়া চুলের রাশি—কোমল সতেজ লাউডগার মত দু'টি হাত—কোথায় মিলিয়ে গেছে। গায়ের রংটা গেছে জ্বলে। কাঁসার থালায় অম্লের দাগ পড়লে যেমন কলঙ্ক ধরে—তেমনি দাগ ওর দু'টি গালে—হনু-ওঠা চোয়ালে চাষাড়ে চেহারার ছাপ। দশ-আনা ছ'আনার ঘাড়-ছাঁটা চুল আর শির-ওঠা হাত আর কোল-বসা দু'টি বড় চোখ অমিতাচারের চিহ্নে জর্জরিত। কামনার বহ্নিশিখায় তিলে তিলে পুড়ছে আশু। এক এক সময় তাপটা দেহে এসে লাগে—মনটা ফাঁকা হয়ে ওঠে—বুকটা কেমন-কেমন করে। সেই ফাঁকা ভরাতে—সেই তাপ বাঁচাতে—লালসার চাদরখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। চোখ বুজে ভাবে—এমনি করে যাকিছু সুখ লুটে নেব—যাকিছু মধু সঞ্চয় করব। উপভোগের পর অবসাদ—সেই অবসাদ কাটাতে আবার উপভোগের উপচার। দেহের অনেক তলায় যে হোমশিখাটুকু এখনো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠতে চাইছে—তাকে জঞ্জালের পর জঞ্জাল চাপিয়ে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আশ্চর্য, ওটুকু কিছুতেই নিভতে চায় না—জ্বালার দীপ—ওরই ধূমদেহ থেকে সন্ধান করে সলিতার।

একটানা নেশায় প্রথম বাধা পড়ল বছর তিনেক পরে—ভুবনমণির মৃত্যুশয্যার ডাক শুনে।

ক্ষুদিরামই খবর নিয়ে এলো, মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা করবি নে আশু? মা যে তোর জন্মের মত চলল!

খবর শুনে সেই হোমশিখাটুকু ধোঁয়া ছেড়ে আগুন হয়ে উঠল। মা যে তোর চলল জন্মের মত! মা-কে কোনদিনই মমতা দিয়ে বাঁধতে চায়নি, শুধু তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে এতবড়টা হয়ে উঠেছে। মা সারা জীবন ধরে দিয়ে গেছেন, সর্বাঙ্গ দিয়ে নিয়েছে আশু। সে দেওয়ার মধ্যে প্রচার ছিল না—নেওয়ার মধ্যেও ছিল না কৃতজ্ঞতা। পৃথিবীর আলো হাওয়া উত্তাপকে সর্বক্ষণই গ্রহণ করি আমরা—কৃতজ্ঞতা জানাবার অবকাশ কোথায়! কিন্তু আলো হাওয়া উত্তাপ সামান্যক্ষণের জন্য যদি রুদ্ধ হয়ে যায়? সে অভাব কত বড় হয়ে ওঠে!

ক্ষুদিরামের সঙ্গে বাড়ী এলো আশু।

এসে যা দেখল—তা আজও জ্বলজ্বল করে যখনই সে দৃশ্য চিন্তায় ভেসে ওঠে। ঘরের মধ্যে মেঝেতে একটি অপরিচ্ছন্ন শয্যা। ছেঁড়া একখানা মাদুর পাতা, তার উপরে ময়লা ছেঁড়া কাপড় বিছানো। সেটা চাদরের বিকল্প। ছেঁড়া চাদরে ছেঁড়া মাদুরটা ঢাকেনি—আরও করুণ হয়ে উঠেছে দারিদ্র্য। মাথার শিয়রে একটি পিতলের ঘটি- ডেড়কোয় মাটির প্রদীপ। ঘরে কাঁসার বাসন একখানাও চোখে পড়ে না—একটা পিতলের ঘড়াও নয়। সেই শীর্ণ শয্যায় চামড়ার পাতের মত মা পড়ে আছেন। চোখ বোজা, গায়ের উপরে চাপা দেওয়া চাদরখানা অল্প উঠা-নামা করছে। তখনও বেঁচে আছেন মা।

বেচাকালী শিয়রে বসে বাতাস করছিল। ওকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। বউরে—চোখ চেয়ে দেখ—কে এসেছে! ওরে তোর সাতরাজার ধন এক মানিক রাশু এসেছে—চেয়ে দেখ।

তখন বাইরের দেখা শেষ করে অন্তরের গভীরে ডুব দিয়েছে

ভুবনমণি। তবু চৈতন্যের শিখায় পৃথিবীর পরিচয়টুকু শেষবারের মত জ্বলে উঠল—ছ'চোখের কোল বেয়ে ধারা নামল ছ'টি।

ওরে রাশু, মায়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে—ডাক মা মা বলে। বেচাকালীর কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল।

চমকে উঠল আশু। এই তার মা—এই তার ঘর! এ ঘরে অশুচি হয়ে ঢুকল কেমন করে—মা-কে কি এই হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়!

তাড়াতাড়ি উঠে বলল, পিসি, একখানা কাচা কাপড় আমায় দে। কূয়োতলা থেকে হাত-পা ধুয়ে আসি।

হাত-পা ধুয়ে কাচা কাপড় পরে আশু এসে বসল মায়ের শিয়রে। মনের মধ্যে হোমশিখায় আহুতি পড়ল—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত আশু মায়ের শিয়র থেকে উঠল না।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকতে গেল একমাস। একমাস হবিষ্যান্ন গ্রহণ—শুদ্ধ-শান্ত চিত্তে অশৌচ পালন—শারীরিক সামান্য ক্লেশ স্বীকার আশুকে আর এক পরিমণ্ডলে নিয়ে এলো। এই ঘর—একে ঘিরেই তো জীবন। এর বাইরে ঝড়—অশান্তি—হাহাকার। নেশার মধ্যে জীবন কোথায়—দাঁড়াবার জায়গা কোথায়? ধোঁয়া টেনে যেমন মাথার মধ্যে চিন্‌চিনে একটা স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা—মদ খেয়ে মত্ততার আমেজ আনা—সমস্ত নেশারই তেমনি এক একটি বিকৃত কড়া স্বাদ—যা পেলেও মনে হয় কি-যেন বাকি রয়ে গেল! আরও চাই—আরও ··

॥ ষোল ॥

দেশের হাটেই বসতে লাগল আশু। চাষাদের কাছ থেকে আনাজপাতি কেনে, গৃহস্থদের কাছ থেকে আলু কেনে—তাদের গাছের ফল—লেবু, ইঁচোড়, বেল, সজনের ডাঁটা কেনে। সব দিনই প্রচুর জিনিস মেলে না। তবু যা কিছু লাভ হয়—তার বেশী লোভ করে না আশু। কোনরকমে তু'টো পেট তো চলে যায়।

চন্দর বলল একদিন, এখন আলুর মরশুম—কাঁল্লায় গিয়ে আলু না আনলে মোটা লাভ করতে পারবি নে ভাইপো। যেমন করে হোক দিন তু'টো টাকা কামাই করতে হবে তো।

না খুড়ো—ও মুখো আর হব না। আশু মাথা নাড়ল।

চন্দর হাসল, ভয় নেই—ডালিম এখন বেদানা হয়ে বড় গাছে আশ্রয় পেয়েছে। শুনছি—ওখেনেই পাকা কোঠাবাড়া উঠবে তার!

চুপ করে রইল আশু। মনের মধ্যে সামান্য চিন্‌চিন করে ওঠে, একটু ব্যথা সামান্যক্ষণের জন্য।

তা মাঝে মাঝে একটু ফুর্ত্তি করিস ভাইপো—না'লে প্রাণটা যে মরুভূমি মেরে যাবে! কাঁল্লায় না যাস—এখানেও তো বড়বাজার রয়েছে—এক আধদিন যাস। বুঝলি? চন্দর বোঝায়।

না খুড়ো, ওসব ভাল লাগে না। কাজের কথা বল।

চন্দর বলল, কাজের কথা আর কি বাবা—নিরিমিষ্যি মানুষ নিয়ে কি সংসার চলে! না হয় বিয়েথাই কর একটা—তবু সংসারটা জমুক।

ছ্যাঁৎ করে উঠল মনটা। বিয়ে! ঘরসংসার? একটি ছোটখাটো মানুষ, একটু মিষ্টি হাসি—অনেকখানি ঘোমটা—আর অনেক লজ্জা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াবে! প্রদীপের সল্‌তেটা উস্‌কে দেবে, কড়ির আল্‌নায় কাপড়-জামা গুছিয়ে

তুলে রাখবে, পান সাজবে, বিছানা পাতবে, জল তুলবে পাত-কুয়োয়, পিসির কাছে ঘুর্‌ঘুর্‌ করে ঘুরবে—রান্নার জোগাড় করবে—আর রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে বলবে, একটা গল্প বল না গো ? কি গল্প ? যা তোমার ইচ্ছে। তোমাদের হাট-বাজারের গল্প, জিনিস কেনা-বেচার গল্প, খদ্দেরের বোকামি-চতুরালির গল্প—ঠাকুর-দেবতার গল্প—যা তোমার খুশি।

পিসিও বলল সেই কথা, তোর মায়ের দুটি সাধ ছিল রাশু। শিবঠাকুরের দোর ধরে তোকে পেয়েছিল—তাই মানত শোধের ইচ্ছে ছিল তোকে নীলের সন্ন্যেসী করে। আর তোকে বিয়ে দিয়ে সংসারে থিতু করা।

আশু বলল, এইবারই আমি নীলের সন্ন্যেস নেব পিসি।

আশু ছুটল পুরুত-বাড়ী। ফিরে এলো শুকনো মুখে।

কিরে—কি বলল—ঠাকুরমশায় ? বেচাকালী শুধোল।

ঘাড় নাড়লে আশু। হবে না।

কেন ?

এবার নাকি অকাল। মা-মরে গেলে অকালের ওষুদ থাকে। এক বছর তাতে ক্রিয়াকম্ম হয় না।

তবে আসচে বারই করিস। তাই ভাল।

আচ্ছা পিসি, নীলের পরব তোরা পালিস কেন ?

ওমা—তা-ও জানিস নে—ওই দিন যে নীলাবতীর বিয়ে শিবের সঙ্গে। নীলাবতী হলেন—মা দুগ্‌গা।

তা শিবের বিয়েতে আবার উপোস দেয় কেন ?

শোন কথা—আমি যেন ভস্‌চাজ্জি মশাই! ওসব ধম্ম-কম্মের কথা কি জানি বাবা। তুই বরঞ্চ পুরুত ঠাকুরকে শুধিয়ে আয়। বেচাকালী বলল।

আচ্ছা—আসচেবার শুধোব।

দিন কিন্তু কাটতে চায় না। সেই একঘেয়ে ফড়েটিগিরি—

এর ওর তার কাছ থেকে মাল কেনা—হাজারটা মিথ্যা প্রবঞ্চনা *দিব্যিদিলেশা। পেটের অন্ন যোগাড় করতে এতও করতে হয়!*

আজকাল সন্ধ্যার পর তাসের আড্ডায় গিয়ে বসে। বাজী রেখে খেলা হয়—হার জিৎ নিয়ে হৈ-চৈ বাধে—কখনো তেলেভাজা ফুলুরি বেগুনি আসে, চা আসে—কোন কোন দিন আসে মদ।

ভাইপো হবে নাকি এক পাত্তর? গ্লাস এগিয়ে দিয়ে চন্দর-খুড়ো হাসে।

অমন করলে আসব না কিন্তু। মুখ ঘুরিয়ে নেয় আশু।

আরে না—না—ঠাট্টা করছিলাম! আমরা কি জানিনা, ভাইপো আমার সতীলক্ষ্মী! হা-হা করে হাসে চন্দর।

খেলাটা বসে চন্দরের বাইরের ঘরে—ভিতরে রতন-মণি বিছানায় বসে গুণ গুণ করে সুর ভাঁজে। এক এক দিন সুরের স্রোত বাইরের ঘরেও ছলছলাৎ করে উথলে ওঠে।

কালীপদ বলে, কে?

পুঁটিরাম বলে—খুড়ী, কি বল গো চন্দরখুড়ো?

হাঁ—ওনারই গলা। গায় ভাল। গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বদ্যিনাথ।

আজ চন্দরের হাসির সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরের শিকলটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। চন্দর বলল, বদে, দেখতো তোর খুড়ি কি বলছে!

বদ্যিনাথ উঠে এলো দোরের কাছে।

চাপা গলায় সকলকে শুনিয়ে বলল রতনমণি, তোমার খুড়োর মতিচ্ছন্ন হয়েছে নাকি? নিজে উচ্ছন্নে যাচ্ছে—পরকেও টানছে! ওই কচি ছেলেটাকে মদ খাও বলতে লজ্জা করল না,—ছি!

বদ্যিনাথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—চন্দর তাস হাতে স্থাণুর মত বসে আছে।

ফের যদি এ সব কথা শুনি—তাসের আড্ডা চুলোয় দিয়ে দেব আমি। রতনমণির ঝাঁজালো স্বরে নিস্তব্ধ হল ঘরখানা।

আশু কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল মনে মনে। তার মঙ্গল চিন্তা করে এমন মানুষও আছে দেশে!

পরের দিন আবার দোরের শিকল ঝন্-ঝনিয়ে উঠল। বদ্যিনাথ বলল, যাও খুড়ো—জোর তলব।

চন্দর শুকনো মুখে বলল, আজ কিছু বলেছি আমি—তোরা সবাই সাক্ষী—, বলতে বলতে দোরের কাছে উঠে এলো।

—না—আজ কিছু বলনি—সে জন্যে ডাকিনি। নরম গলায় বলল রতনমণি। ওই ছেলেটি কি নাম যেন ওর—আশু—ওকে পাঠিয়ে দাও তো।

কেন—হঠাৎ ওকে—

রতনমণি ঈষৎ ঝেঁজে উঠলো, আমার ইচ্ছে। সব কেন'র জবাব নেই।

তাড়া খেয়ে তাসের আসরে এসে বসল চন্দর। আশুর পানে চেয়ে বলল, ভাইপো, তোমার খুড়ী ডাকছে—একবার ভেতরে যাও।

আমাকে! অবাক হল আশু।

তাইতো বলল! যাও—না হলে খিঁচুনি খেয়ে প্রাণ যাবে আমার। ফিস্‌ফিস্ করে বলল চন্দর।

দোরের কাছে এসে দাঁড়াল আশু। আমায় ডাকছেন?

হাঁ—ভেতরে এসো। কেন ডাকতে নেই? এতদিন আসা যাওয়া করছ—খুড়ি বলে একবারও সংবাদ নিয়েছ কি? মিষ্টি গলায় বলল রতনমণি।

রতনমণির পানে চেয়ে কেঁপে উঠল আশু। এক ঝলক বিদ্যুৎ যেন কালো মেঘের বুক চিরে ঝিলিক মেরে উঠল। রতনমণির রঙে বিদ্যুৎ—বেশভূষায় বিদ্যুৎ—মুখের হাসিতে আর চোখের চাউনিতে বিদ্যুৎ।

ওকে অবাক হয়ে চাইতে দেখে—আর একবার হেসে উঠল

রতনমণি। ওর সারা অঙ্গ দুলে উঠল—ফুলঝুরির মত বিদ্যুতের ফুল্‌কি ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে।

আশুর ইচ্ছে হয়েছিল—পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে—হাত উঠল না।

বস। তোমাকে ওরা ভারি জ্বালাতন করে, নয়? তা তুমি সোজা চলে আসবে ভেতরে। আমার সঙ্গে গল্পগাছা করবে—মন ভাল থাকবে। কথার শেষে মিষ্টি করে হাসল রতনমণি। চোখে যেন কিসের ইসারা। এ দৃষ্টির অর্থ অজানা নয় আশুর—ডালিমের চোখে এমনি ইসারা বহুবার দেখেছে।

অথচ চলে যেতে পারল না। বসে বসে ঘামতে লাগল আশু। বাটিতে সুজির পায়স—রেকাবিতে গরম বেগুনি—সামনে বসে রতনমণি অনুরোধ করছে, খাও। নিজের হাতে ভাজলাম বেগুনি—খেয়ে বলতে হবে দোকানের চেয়ে ভাল কি না!

ভাল কি মন্দ সে স্বাদ আশুর জিহ্বায় ধরা পড়ল না—ও শুধু বসে বসে ঘামতে লাগল।

রতনমণি ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আহা—ঘামছ যে! বাতাস করি। পাখাখানা হাতে নিতেই আশু প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল, না—না।

কি—না? অবাক হ'ল রতনমণি।

এ সব তো খেতে পারব না। কোনক্রমে বলল আশু।

যা পার খাও। না খেলে বুঝব—আমাকে মোটেই ভালবাস না। চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গি করে আর একটু সরে এলো রতনমণি।

হঠাৎ ডিসখানা ফেলে রেখে আশু ছুটে পালাল ঘর থেকে।

বষ্টিনাথ বলল, ব্যাপার কি-রে আশু? তোকে কি বাঘে তাড়া করেছে?

পুঁটিরাম চোখ টিপে হাসল, আশ্চর্য কি! খুড়ীকে সোঁদরবনে

সাঁদ করিয়ে দিলে—যত হুলো বাঘের দফা গয়া! সেই যে কথক ঠাকুর—কি যেন ভাল ছড়াটা বলল সেদিন ঃ

দিনে বাঘ আর
রেতে রাক্ষুসী—

বজ্রিনাথ বলল, দিনকা বাঘিনী রাতকা মোহিনী
পলক পলক লহু চোষে,
দুনিয়া অ্যাইসা বাউরা হুয়া
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

মানেটা? পুঁটিরাম জিজ্ঞাসা করল।

মানে খুড়োকে জিগ্‌গেস কর—গুপীকে জিগ্‌গেস কর। .

তাসের গোছা ছড়িয়ে ফেলে চন্দর বলল, মেলা ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করিস তো রইল তোর খেলা!

॥ সতেরো ॥

আশু তখনও পথ দিয়ে ছুটছে। জ্যোৎস্না রাত, পথঘাট বেশ স্পষ্ট। জ্যোৎস্না মেখে নারকোল পাতা কাঁপছে—কাঁঠাল পাতায় পিছলে পড়ছে জ্যোৎস্না। চাঁদের বরাবর দু'টো ছোট পাখী উড়ছে। চকোর কি? ওরা চাঁদের সুধা ছাড়া কিছু খায় না। এখন এসব কিছুই চোখে পড়ল না আশুর—সামনে যে মানুষটা আসচে তাকেও না। তারই ঘাড়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল আশু।

কে—আশু না?

ও—ক্ষুদে-দা। ক্ষুদিরামকে জড়িয়ে ধরল আশু।

কিরে—ভূত দেখেছিস নাকি? হেসে উঠল ক্ষুদিরাম।

হাঁ—ভূতই। আমার একটা কথা পিসিকে বলবে ক্ষুদেদা? এখুনি বলবে চল। ক্ষুদিরামের হাত ধরে সজোরে টানতে লাগল আশু।

তা কথাটা কি! এমন করে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিস কেন? হতচকিত ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করল।

আশু উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল, আমি বিয়ে করতে রাজী। সামনে যে দিন পাওয়া যাবে—

ব্যাপার কি আশু? এত তড়িঘড়ি? হাসল ক্ষুদিরাম।

না-না—হাসি-ঠাট্টার কথা নয়।—বিয়ে যদি না হয় কালনায় চলে যাব। সত্যি বলছি—মা কালির দিব্যি—। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল আশু।

ক্ষুদিরাম গম্ভীর হয়ে বলল, সব বিত্তান্ত খুলে বলবি আশু?

বলব। চল ইস্কুলের মাঠে গিয়ে বসি গে।

মাঠে বসে সমস্ত খুলে বলল আশু।

ক্ষুদিরাম বলল, তোর অনুমান মিথ্যে নয় আশু। ও মাগী সহজ নয়, সবাইকে দাগা দিয়েছে। ডাইনী মাগী। তা তুই ওখানে না গেলেই পারিস।

আশু বলল, আমার মনে জোর নেই। এমন কেউ নেই যে আমায় টেনে রাখে। তুমি চেষ্টা কর ক্ষুদেদা—ক্ষুদিরামের হাত চেপে ধরল আশু।

আচ্ছা কন্যের সন্ধান করছি আমি—তারপর তোর পিসিকে বলব। উনি তো আবার জয়ঢাক—শুনলেই ঢাক পিটবে গ্রামে।

পরের দিন সকালেই ক্ষুদিরাম এসে ডাকল, আশু আছিস?

কেন—ক্ষুদেদা?

চট্‌পট জামা গায়ে দিয়ে আমার সঙ্গে চ, কথা আছে।

ইঙ্গিতটা বুঝে যথাসাধ্য সাজসজ্জা করে বাইরে এলো আশু।

গ্রামের পথ ছাড়িয়ে মাঠের পথ ধরল দু'জনে।

ক্ষুদিরাম বলল, হরিপুরে যাচ্ছি, ওখানে একটি ভাল মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল কাল।

কে সন্ধান দিলে?

বউ। বউকে কাল বললাম সব কথা। ও বলল, তা আমার জানা-চেনা একটি মেয়ে আছে—বছর বারো তেরো বয়েস। তোমার উনি যেমন চাইছে—তেমনি।

রঙ ফরসা? মুখের কাটুনি ভাল? সাগ্রহে প্রশ্ন করল আশু।

সেইজন্যেই তো তোকে সঙ্গে নিলাম—নিজে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবি।

কিন্তু রঙটা কেমন বলই না? কৌতূহলে সারা মুখ জ্বলছে আশুর।

ক্ষুদিরাম হাসল। বলল, ওতো বলল—ফরসাই। বলল তো মটর ডেলের মত। আর মুখচোখের ছিরি আছে।

আশুর চোখে ফুটে উঠল—ডালিম আর রতনমণি। একজন মাজা-মাজা রঙের লণ্ঠনের আলো, আর একজন চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ। মটর ডালের রঙটা ঠিক চোখে ফুটলো না।

আচ্ছা ক্ষুদেদা—মেয়েটা কাজকম্ম জানে তো ভাল?

শুনলাম—ওরই ঘাড়ে সংসার। উঠোন ঝাঁট গোবর লেদি দেওয়া থেকে রান্নাবান্না সব ওই মেয়েই করে।

কেন—বাড়ীতে আর কেউ নেই?

আছে—মা আছে। তা তেনার শরীলটা তেমন যুতের নয়, হাঁপানির টান ধরে যখন—

অধীরকণ্ঠে শুধোল আশু, লেখাপড়া জানে?

জানে—কাজ-চলা-গোছ। বই পড়ে তোর পিসিকে শোনাবে—তোকেও—

পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ল আশু। বলল, তা'লে থাক।

সেকিরে! ক্ষুদিরাম তো অবাক। আশুর পানে চেয়ে দেখে ওর মুখে কৌতূহলের আলো নিভে গেছে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল আশু, আমার লেখাপড়া হয়েছিল সামান্য—

এতকালে সব ভুলে মেরে দিইছি। লেখাপড়া-জানা মেয়ে এলে ঘেন্না করবে না আমায় ?

ওরে—না—না, সে-ও কি এতদিনে ভুলে মেরে দেয়নি সব! অত কাজের চাপ যার ঘাড়ে—তার মাথায় বিদ্যেদেবী থাকতে পারে! অভয় দিল ক্ষুদিরাম।

তাই বল ক্ষুদে-দা! হাসল আশু। যা ভাবনা হয়েছিল মাইরি!

হরিপুর ছাড়িয়ে আরও একখানা মাঠের ওপারে গ্রাম—রঘুনাথপুর। বেশীর ভাগ চাষী-গৃহস্থের বাস। একখানাও কোঠাঘর নেই—সবই চালাঘর। উঁচু মাটির দাওয়া—তকতকে করে নিকোনো উঠোন—উঠোনের উপরে লাউ-মাচা, পুঁই-মাচা—লঙ্কা ঢ্যাঁড়সের গাছ। যে কোন বাড়ীর কঞ্চির আগড় ঠেলে গাব-ভেরেণ্ডার বেড়া দেওয়া উঠোনে যে কেউ প্রবেশ করতে পারে। সেই বেড়ার গায়েও উচ্ছে ঝিঙ্গে ধুঁধুঁলের লতায় হলদে ফুল ফুটে রয়েছে—ফল ধরেছে অজস্র।

গরীব গ্রাম—শ্রীহীন নয়। এই তো শাশুড়ীর উঠোনে (সম্বন্ধ না গড়লেও আশু মনে মনে সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে।) খেজুরের চ্যাটাইয়ে সিদ্ধ করা ধান শুকোচ্ছে। উত্তর দিকের কোণে একটি ঢেঁকিশালও যেন চোখে পড়ল। ঢেঁকির পোয়া দুটো জীয়ল গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী—শাখা প্রশাখারা খড়ের চালা ভেদ করে আকাশ দেখছে—তসিল দুটোও বা'র হয়ে রয়েছে। ঢেঁকির পিছনদিকটা চক চক করছে—মেয়েদের পায়ের আঘাত খেয়ে খেয়ে ওখানটা ময়লা জমতে পায় না।

দু'জনে দাওয়ায় এসে বসল। ক্ষুদিরামের অচেনা বাড়ী নয়। বৌয়ের সম্পর্কে বেশ মিষ্ট একটি সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে ক্ষুদিরাম।

দিদিমা—এই পাত্তরটিকে নিয়ে এলাম—উমাকালির জন্যে।

এখেনে এলেই দু'বেলা খোঁটা দিয়েছ—এখন দেখে শুনে নাও। সপ্রতিভ হাসি হেসে আপ্যায়িত করল ক্ষুদিরাম।

এই ছেলেটি? বাঃ—বেশ। মাথার কাপড়টা একটু টেনে খুশিভরা কণ্ঠে বর্ষীয়সী বললেন। ওঁর নাম নৃত্যকালী।

ক্ষুদিরাম আশুকে অল্প ঠেলা দিয়ে ইসারা করতেই—আশু পায়ের ধুলো নিলে।

নেত্যকালী আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, থাক—থাক। বেঁচে-বর্তে থাক, আমার মাথায় যত চুল তত পেরমাই হোক।

মেয়েও দেখল আশু। কল্পনার চড়া রঙটা অবশ্য রইল না—, তবু মন্দ লাগল না। রঙটা ভাল। চুলগুলো কটা কটা। চোখ তেমন বড় নয়—সর্বক্ষণই চোখ বুজে বসে রইল বলে বোঝাই গেল না সেটা ভাসন্ত কিনা। তেরো বছরের মেয়ে—খুব বাড়ন্ত গড়ন নয়। তবু শ্রী আছে যেন। যাই হোক—কল্পনায় না মিললেও, অপছন্দ হ'ল না।

নেত্যকালী বলল, বিয়ের কথা কয়ো তোমার দাদামশাই'এর সঙ্গে—দেনা পাওনার ঝঞ্ঝাট আছে তো!

বাইরে এসে ক্ষুদিরাম বলল, কেমন—যা বলেছিলাম মিলল কিনা? পছন্দ তো?

আশু খুঁত খুঁত করল, রঙটা কটা নয়?

মেলা ফরসা হলেই রঙ কটা দেখায়। ক্ষুদিরাম কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইলে।

চোখ বড় কি ছোট বোঝা গেল না—সর্বক্ষণই বুজে রইল!

বুজে থাকবে না তো প্যাঁট প্যাঁট করে চাইবে নাকি! এ কি শহুরে মেয়ে—না খেমটাউলি?

দেনা পাওনার কথা কি বলল?

ও একটা আছে। এই আমার বিয়েতে তিনকুড়ি টাকা দিয়ে তবে বউকে আনতে পারলাম।

আশু শুকনোমুখে বলল, টাকা পাব কোথায়? এই তো উপার্জন!

ওর পিঠে চাপড় মেরে ক্ষুদিরাম হেসে বলল, কুছ পরোয়া নেই—ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব কি! চন্দর-দাকে ধরা যাবে'খন।

চন্দর-দা কোথায় পাবে টাকা?

ওর টাকার অভাব? বোয়ের গায়ে গহনা দেখেছিস তো! ক্ষুদিরাম অভয় দিল।

না-না, ওখানে টাকা ধার করতে পারব না। প্রবলবেগে মাথা নাড়ল আশু।

ক্ষুদিরাম হেসে উঠল, দূর বোকা—ওরা টাকা ধার দেয় না। দেঁড়েমুষে আদায় করে। একটু চিন্তা করে বলল, তা শিবু মিত্তিরকে ধরলেও হয়ে যাবে। চোটায় টাকা ধার দেয়—ও। দিনকের দিন টাকা ফেলে দিবি—গায় লাগবে না।

কি রকম?

এই ধর—দশটা টাকা ধার নিয়েছি সেদিন—একমাসে শোধ করবার কড়ারে। রোজ আট আনা করে ফেলে দিচ্ছি। ব্যস, একমাসে সব কিলিয়ার। এখন থেকে ভাবনা কেন—দাদামশায় কি বলে দেখই আগে।

তাহলে কাল থেকে কালনায় আলু আনতে যাব—বেশী বেশী লাভ না হলে—

নিশ্চয়। ভয় করবে না? ক্ষুদিরাম হাসল।

বৈকেলে যাবই না—ভোরে যাব—সকালে ফিরব। ও মুখো হব না।

বেশ—তোর সঙ্গে আমিও যাব।

বেচাকালীও শুনল কথাটা। ক্ষুদিরামের বৌয়ের মুখেই শুনল। হেসে বলল, আহা—তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বউ—রাশু আমার সংসারী হোক।

ক্ষুদিরামের বউ বলল, মর্যেদার টাকা দিতে হবে ওনাদের, একটা নেয়ম আছে কি না!

ওরা কি মেয়ে-বেচার ঝাড়? বেচাকালী বিস্মিতমুখে প্রশ্ন করল।

না—তা ঠিক নয়—ওনাদের বংশে নেয়ম আচার কি না—

কত টাকা দিতে হবে?

ছ'কুড়ি দশ হলেই হবে শুনিছি? আজই তোমার ভেয়ের মুখে শুনলাম ঠাকুরঝি।

ছ'কুড়ি দশ—অত টাকা রাশু পাবে কোথায়? বেচাকালীর মুখ ভার হলো।

পুরুষমানুষের টাকার ভাবনা—রোজগার করবে।

বেচাকালী বাড়ী এসে ক্ষুদিরাম ও আশুকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখল। আশুকে বলল, পারবি এত টাকা যোগাড় করতে?

দেখি।

বেচাকালী বলল, সোনার বোতাম ক'টা থাকলেও বা ভরসা হতো—সবই তো খইখল্লা করে উড়িয়ে দিলি!

দেখি কি হয়। আশুও ভাবতে লাগল।

ক্ষুদিরাম বলল, শিবু মিত্তিরের কাছে যাই চল্—পরামর্শ করি একটা।

অনেক কষামাজা করে শিবু বলল, চোটার নিয়ম নয় বেশী দিন টাকা ফেলে রাখা—অল্প মেয়াদী টাকা কিনা। ছ'মাসে শোধ দিতে পারবি নে? দিন আট আনা করে দিতে প্যারলে গায়েও লাগবে না। কেমন, অন্যায্য বললাম ক্ষুদে? তোরাও আট আনা করে দিস প্রতিদিন—সেই রেটেই ও দেবে—অথচ এতবড় একটি কাজ হয়ে যাচ্ছে।

পথে এসে আশু বলল, আরও পঞ্চাশটা টাকা না হলে ইদিকে সামাল দেব কি করে! লোকজন আত্ম-কুটুম বন্ধু-বান্ধব আছে—

তা বটে। পিসিকে বলে দেখ না—বুড়ীর হাঁড়ী কলসীতে কিছু কি আর লুকোনো নেই।

না, ওদের অনেক ক্ষেতি করেছি—আর করব না। আলু বিক্রী করে টাকা জমাবো ক্ষুদে-দা—বিয়েটা না হয় ছ'মাস পরেই হবে। এখন থেকে রোজ আট আনা করে জমাবো—মনে করব, চোটা নিয়ে সুদ দিচ্ছি মিত্তির মশাইকে।

সেই ভাল। কিন্তু টাকাটা রাখবি কোথায়? আমাদের ধাত-গোত জানতে তো বাকি নেইরে ভাই—হাতে টাকা জমলেই খালি মনে হয় কতক্ষণে খরচ করি!

পিসির কাছেই রাখব না হয়।

ঠিক ঠিক। ওরা যক্ষিবুড়ির মত আগলে-পিগলে রাখে জিনিস। ফুটো কলসী—ভাঙ্গা হাঁড়ী—ছেঁড়া কাঁথা মাদুর কিচ্ছু ফেলে না। বলে হো হো করে হেসে উঠল।

প্রথম দিন আধুলিটি হাতে পেয়ে বেচাকালী হাসিমুখে বলল, মা সিদ্ধেশ্বরীকে পূজোর মানত করলাম রাশু, এটা তুলে রাখি। মাথায় ঠেকিয়ে আধুলিটি কাঠের কৌটোয় রাখল।

॥ আঠারো ॥

বেশ চলল—তিনচার মাস। শীতের মরশুমে আনাজপাতি উঠল প্রচুর। কলকাতা থেকে ফুলকপির চালান নিয়ে মোটা টাকা কামালো আশু।

কালিপদ, পুঁটিরাম, বদ্যিনাথ, গুপী—সবাই ধরে বসল খাওয়াতে হবে। ভাদ্র মাসে খালে গঙ্গার জল এসেছে—মাইলের পর মাইল ভেসে গেছে জলে। বলতে গেলে গঙ্গা আর নেই—সমুদ্র হয়েছে। বাঁধের কোলে এসেছে গঙ্গা—চারিদিকে থৈ থৈ করছে জল। ফুলে-বয়রার কোল থেকে নৌকো ছেড়ে—পানপাড়া বেলেডাঙ্গার কোল

পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাও। শান্তিপুর, কালনা—গুপ্তিপাড়া থেকে বাগ্‌দেবীর বিল পর্যন্ত গঙ্গা একাকার হয়েছে। দলে দলে মানুষ বাচ খেলে বেড়াচ্ছে তার উপর। বিকাল থেকে সন্ধ্যা—আর সারা রাত চলে নৌকা ভাসিয়ে বাচখেলা। নৌকায় হারমোনিয়ম বাজে—গ্রামোফোন বাজে—সুর অসুরের ঐকতান ওঠে—হৈ হৈ কলরব—সব-একাকার-করা প্রকৃতিকে নিয়ে সব-বাঁধন-ছেঁড়ার মাতামাতি।

এত খরচ আমি পারব না। আশু বলল।

সবাই দেব চাঁদা করে। তুই মাংস আর মালের দামটা দিবি শুধু। পুঁটিরাম বলল।

না, ও পথে শম্মা আর নয়। গম্ভীরমুখে বলল আশু।

গুপী বলল, না খেলে কেউ জোর করে খাওয়াতে পারে! বলি আমরা তো তোর মত সতীলক্ষ্মী হইনি—আমরা টানব। তুই চাট খাবি বসে বসে। মাংস, হাঁসের ডিম ভাজা।

ক্ষুদে-দা থাকবে? আশু শুধোল।

থাকবে বলছে তো। তবে রাত বারোটা পজ্জন্ত। ওকে—গড়ের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে আমরা সারারাত বাচ খেলব।

আমিও নামব—ওর সঙ্গে।

ক্ষুদের বউ খাণ্ডার বলে ক্ষুদে সাহস করে না—তোর তো মাথার ওপর কেউ নেই! গুপী বলল।

তা হোক—আমিও নামব। দৃঢ়কণ্ঠে বলল আশু।

বেশ—নেমো। কচি খোকা তো নও যে ধরে বেঁধে রাখব! বিরসমুখেই জবাব দিল গুপী।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমী তিথি। স্থির সমুদ্রের উপর চাঁদ উঠল আট ন'দণ্ড পরে। ম্লান ছলছল জ্যোৎস্নার প্রথম কিরণ এসে পড়ল নৌকায়। শ্মশানঘাটের রাস্তায় যেখানে গঙ্গাপুত্ররা

থাকে—জগন্নাথ বিগ্রহ থাকেন—সেইখানটায় কয়েকটা বট অশ্বত্থ গাছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে—তারই শাখা প্রশাখার মাঝখান দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে নৌকার ছই'এর মাথায়। দাঁড়ীর পিঠ ছুঁয়েছে আলো। হাতের ঠেলায় দাঁড় যখন জলের উপরে উঠছে—দাঁড় থেকে ঈষৎ ময়লা কাঁচের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। জ্যোৎস্না ভাল করে ফোটেনি এখনও। এই কাঁচই জ্যোৎস্না ফুটলে হীরের কুচির মত জ্বলবে।

নৌকায় হারমোনিয়াম কোলে টেনে গান ধরেছে কালিপদ। গলাটা ওর মিহি—দূর থেকে শুনলে মেয়েরা গাইছে মনে হয়।

গুপী বলল, তুই গেয়ে যা কেলে—চোখ বুজে না হয় ভাবব—বিমলা কি রাণী গাইছে। ত্বধের সাধ ঘোলেই মিটুক গে। ওদের কাউকে নিলে কেমন জমত মাইরি—তা ছুঁচিবেয়ে ঠাক্‌মার দল উঠেছে নৌকোয়—

কালিপদ গাইছিল ঃ

আমার এই রীতি তোমা বই আর জানিনে—
ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে।
বিধু মুখে মধুর হাসি—দেখতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি
দেখা দিতে আসি নে।

কোঁচার কাপড়টা মাথায় ঘোমটার মত জড়িয়ে—কোমরে ত্ব'হাত রেখে—তড়াক করে লাফিয়ে উঠল গুপী। সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম নাচ আর চীৎকার!

বা ভাই—বা ভাই—বেশ।

নৌকা টলমল করে উঠল—মুখটা জলের মধ্যে ঢুকে গেল।

গুপীকে তখনই ধরে বসাল সবাই—নৌকার ত্বলুনিও থামল। কিন্তু জলের উপর অল্পই জেগে রইল নৌকা।

বদ্যিনাথ বলল, অনেকখানি জল ঢুকেছে নৌকোয়—ছেঁচে ফেলতে হবে।

নারকোলের মালা—আরও বড় মত একটা কাঠের পাত্র ছিল নৌকায়—তিন-চারজনে মিলে জল সেচতে লাগল।

নৌকা অনেকখানি জেগে উঠল জলের উপরে—দাঁড়ের টানে তর তর করে ভেসে চলল আবার।

খাল থেকে মূল গঙ্গায় পড়ল নৌকা। কি তীব্র স্রোত—আর গোঁ গোঁ ডাক! সেই টানে ছোট একগাছা কুটোর মত ভেসে চলল নৌকা। গান থেমে গেল—কলরব থেমে গেল।

সামাল দাও, সামাল দাও। শক্ত করে চেপে ধর হাল যত জোর আছে—উজান স্রোতে বেয়ে যাও দাঁড়। স্রোত কাটিয়ে কূলের কাছে ভিড়িয়ে দাও।

আধঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের পর নৌকা কালনার ঘাটে ভিড়ল। হালী দাঁড়ী সবই তখন এলিয়ে পড়েছে। পালা করে প্রত্যেককে দাঁড় টানতে হয়েছে—জল সেচতে হয়েছে।

গুপী নৌকার পাটাতনের উপর শুয়ে পড়ল। বলল, মাল আনাও—না হলে আর বইছে না শরীল।

এখন মামার দোকান খোলা আছে কি?

নিশ্চয়—নিশ্চয়। এই বাচের সময় তো ওদের মরসুম! সামনের দরজা বন্ধ, পিছু দরজায় টোকা দিলেই খুলে দেবে।

সঙ্গে আছে লুচি মাংস তার সঙ্গে ভাজামত একটা কি। কালনা থেকে মিষ্টি কিনে নেওয়া হল—পানতুয়া। আর মদ।

সবাই গোল হয়ে বসল।

বদ্যিনাথ মদের গ্লাস হাতে করে বলল, আশু ভাই, এক পাত্তর হবে না?

না।

সামান্য খাও—নেশা হবে না—গায়ের ব্যথা কমবে। আবার এতখানি পথ দাঁড় টানতে হবে তো। ক্ষুদেদা—

ক্ষুদিরাম নেশা জমাবার জন্য মদ খায় না। কখনো-সখনো কোন উৎসবে কি খুব ক্লান্ত হয়ে—কিংবা বেশী উপার্জন হলে এক আধ গ্লাস টেনে মুখে একটা ছোট এলাচ ফেলে দেয়। সেটা চিবোতে চিবোতে বলে ব্যস—ব্যস। হাজার অনুরোধেও দ্বিতীয় গ্লাস মুখে তোলে না। এক গ্লাস উদরস্থ করে ক্ষুদিরাম বলল, ব্যস—ব্যস।

বদ্যিনাথ আর একটি গ্লাস পূর্ণ করে আশুর সামনে ধরে বলল, একযাত্রায় পৃথক ফল কি ভাল ভাই? নাও, খেয়ে নাও। তুমি না হয় ক্ষুদেদার মত ব্যস—ব্যস করো!

আশুই দাঁড়ে বসেছিল বেশীক্ষণ—টেনেছেও প্রাণপণ শক্তিতে। গঙ্গায় স্রোতের উজান আসতে মনে হয়েছে সব শক্তি ফুরিয়ে গেল বুঝি! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে—জলতৃষ্ণায় নয়। চোখের সামনে ওরা বসে বসে মদ খাচ্ছে—মদের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ সারা শরীরে জড়িয়েছে তৃষ্ণা। নিঃশেষিত শক্তি ওরই একটি চুমুকে হয়তো বা ফিরে আসবে।

সম্মোহিতের মত হাত বাড়াল আশু। গ্লাসটা উপুড় করে দিল মুখে। তৃষ্ণা কমল না—আবার হাত বাড়াল আশু। আবারও হাত বাড়াল।

চতুর্থবারে ওর গ্লাসশুদ্ধ হাতখানা খপ করে চেপে ধরল ক্ষুদিরাম। চেঁচিয়ে উঠল, ব্যস—ব্যস—

আশুর চোখে তখন মত্ততার ঘোর। সারা দেহে আগুন ধরে গেছে। ক্ষুদিরামের হাতখানা ঠেলে ফেলে চীৎকার করে উঠলো, চোপরাও। গ্লাসের পর গ্লাস নিঃশেষ করল আশু—ট্যাঁক থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে ছুড়ে ফেলল পাটাতনের উপর। বলল, লেয়াও মদ।

কালনায় মাটিতে পা দিয়ে পুরাতনদিনের রক্ত আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছে আশুর। হারমোনিয়ামটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে জড়িতকণ্ঠে গান ধরল।

রমণীর মন কাঁচের বাসন ভাঙ্গলে পরে জোড়া দায়।

আবার নৌকা ভাসল। দরিয়ার তীব্র টানে ভেসে চলল নৌকা শান্তিপুরের দিকে। হৈ হুল্লোড় কলরব। তলায় স্রোতের টান, উপরে উদ্দাম ঝড়। সেই ঝড়ে কোথায় রইল ক্ষুদিরাম—কোথায় তলিয়ে গেল আশু।

॥ উনিশ ॥

বেচাকালী কাঁদতে কাঁদতে ক্ষুদিরামের বাড়ী এসে বলল, হাঁরে ক্ষুদে—যা শুনছি সত্যি? রেশোটা নাকি আবার ওই যমে-খেকোদের দলে ভিড়েছে?

হাঁ পিসি।

হাঁরে—তুইতো সঙ্গে ছিলি—ওর কান ধরে টেনে আনতে পারলি নে?

আমাকেই কান ধরে নামিয়ে দিলে নৌকা থেকে। সবাই একজুটি হয়ে আমাকে নামিয়ে দিলে।

অা আমার কপাল—ছোঁড়া গেল কোথায়? সেই পরশু সন্জে-বেলায় গেছে—আজও চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই। আবার বুঝি কাঁল্লায়—সেই যমের বাড়ী গিয়ে ঢুকেছে?

না পিসি, এখানেই আছে। বড় বাজারে।

একবার দেখ্বি বাবা? হেই বাবা, দেখ একবার। বেচাকালী ক্ষুদিরামের দুহাত চেপে ধরল।

আচ্ছা—খবর নিচ্ছি। তবে সেখানে যেতে পারব না—ওরা শাসিয়েছে আমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে বলে।

বেচাকালী ঝেঁজে উঠল, ইস্—কোন্ ঘাটেপড়া শাসিয়েছে রে! চ আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে—দেখি কত ধানে কত চাল!

না পিসি আমিই খবর আনব আজ।

সেদিনও এলো না আশু—তার পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল ওদের বাড়ীর সামনে। বেচাকালী সদর দোর খুলতেই বদ্যিনাথ বলল, শীগগির একটা বিছানা পেতে দাও পিসি—আশুর ভয়ানক অসুক।

ওমা—আমার কি হবে গো—সব্বনেশেরা কি খবর নিয়ে এলো গো! মড়া-কান্না সুরু করে দিলে বেচাকালী।

বদ্যিনাথ বলল, কেঁদো পরে—আগে বিছানাটা পেতে দাও।

ওরা ধরাধরি করে আশুকে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিলে। যাবার সময় বলল, ডাক্তার ডেকে দেব?

আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই—যমের বাড়ী যাও সব। মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল বেচাকালী। কি আমার সুহৃতের দল—গরু মেরে জুতো দান করতে এসেছে! ঝ্যাঁটা মার মুখে, ঝ্যাঁটা মার। রণরঙ্গিনীর সামনে থেকে সরে পড়ল ওরা।

ক্ষুদিরামকে ডাকলে বেচাকালী—ক্ষুদিরাম ডাক্তার নিয়ে এলো। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, অসুখটা খারাপ বলেই মনে হচ্ছে। কোন কুস্থানে যাতায়াত আছে বুঝি ছেলেটার?

আজ্ঞে—তা একটু বারটান আছে। ক্ষুদিরাম বলল।

আপাতত জ্বর ছাড়বার ব্যবস্থা করছি—পরে ও রোগের চিকিৎসা। কিছু টাকা খরচ হবে।

ক্ষুদিরাম চুপ করে রইল।

জ্বর ছাড়লে ক্ষুদিরাম বলল, এবার আসল রোগের চিকিচ্ছে—টাকা চাই।

টাকা কোথায়—? আশু ম্লান হাসলে।

সব ফুঁকে দিয়েছিস্! ক্ষুদিরাম অবাক হ'ল।

সব। তোমরা কেন আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ ক্ষুদে-দা—আমি মরে গেলেই তো ভাল। বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল আশু।

ওকি, কাঁদছিস?

জীবনে ধিক্কার এসেছে ক্ষুদে-দা। কুকুর যেমন জুতোর গন্ধ পেলেই রাজভোগ ছেড়ে দৌড়ে আসে—আমারও সেই দশা। রক্তের সঙ্গে বিষ মিশে আছে—ও রোগ যাবার নয়। টপ্ টপ্ করে জল ঝরতে লাগল দু'চোখ বেয়ে।

ক্ষুদিরাম বলল, মানুষেই সব পারে। মন্দ হতে পারে—ভাল হতেও পারে। কুকুর চামড়ার গন্ধ পেলে ছুটে আসে—মানুষ মন ঠিক করলে কোন লোভেই টলে না।

মন্দ মানুষ ভাল হতে পারে? আশু ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

ক্ষুদিরাম বলল, পারে। শুনিসনি রামায়ণে—যে লোকটা রামায়ণ লিখেছিল—সে ছিল ডাকাত—মানুষ মারত—তাদের টাকাকড়ি লুটে নিত। সেই ডাকাত রাম নাম করে মুনিঋষি হল—অতবড় ধম্মের বই রামায়ণ লিখল।

আমায় ভাল করে দে ক্ষুদেদা—আমি দিব্যি করছি।—ক্ষুদিরামের দু'টি হাত চেপে ধরল আশু।

থাক্—থাক্। এখন কথা শোন—টাকা না হলে চিকিচ্ছে হবে না—শরীল সারবে না। মেলা ডাক্তার খরচ করতে না পারিস্, তার চেয়ে এক কাজ কর বরঞ্চ। ও রোগের ভাল ওষুধ আছে শুনিছি—তাই বরঞ্চ এক শিশি আনিয়ে খা। তোর টাকা না থাকে—আমি দেব। ভাল হয়ে শোধ করিস।

কি ওষুধ আনাবো?

দাঁড়া—পাঁজির পাতায় মেলাই ওষুধের কথা লেখা আছে—তাই দেখে ঠিক করে নেব।

সেই ঔষধ খেয়ে ভাল হয়ে উঠল আশু। বাইরে রোগের কোন চিহ্ন রইল না—শরীরও কান্তিমান হল। একটু অবসাদ—জ্বালা সামান্য ভিতরে রইল যেন—ও কিছু নয়। নাওয়া খাওয়া করলেই সেরে যাবে।

আবার চোটা নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নামল। যা খুইয়েছে নিজের নির্বুদ্ধিতায়—তা উশুল করে নিতে হবে।

একদিন গুপী শুধোল, কেমন আছিস-রে? রানী তোর কথা পেরাই বলে—

ঝাঁ করে একটা পেয়ারা এসে লাগল গুপীর মাথায়। চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল আশু, শালা—ফের যদি ওদের কথা বলবি—খুন করব তোকে।

গুপীও আস্ফালন করল, আহা-হা—সতীনক্ষীরে—!

তেড়ে গেল আশু—গুপী ছুটে পালাল।

একদিন ক্ষুদিরাম বলল, আসচে ফাগুনেই বিয়েটা করে ফেল আশু।

মাথা নাড়ল আশু, না—চোত মাসে বাবার মানত শোধ দিয়ে তবে সংসার করব। অনেক পাপ করিছি ক্ষুদেদা, পেরাচিত্তির না করলে মনডা ঠাণ্ডা হবে না।

তবে বোশেখেই ভাল—নতুন বছর। টাকাও জমবে কিছু।

আশু শুধোলে, আচ্ছা ক্ষুদেদা—নীলের সন্ন্যাসী হয় কেন লোকে?

মহাদেবের মানত আর কি। যাত্রার পালা শুনিস নি- সমুদ্দুর মন্থনের?

না তো—গল্পটা বলবে?

শোন তবে।

ক্ষুদিরাম সমুদ্র মন্থনের গল্প করতে লাগল—অবাক হয়ে শুনল আশু।

গল্প শেষ হলে বলল, আহা—হা—এমন দেবতাও হয় ক্ষুদেদা! নিজের গলার মধ্যে বিষ থুয়ে তিরভুবন বাঁচাল! আহা—হা!

হয় বইকি। আবার শিবকে সবাই ছুঁতে পারে—পূজো করতে পারে। একটি বেলপাতা দাও—ব্যস—অমনি তুষ্টু। কি বর নিবি নে। ভস্মলোচনের পালাটি বুঝি শুনিসনি?

বলনা গল্পটা? আশু কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

এমনি করে গল্প শোনে আশু—যাত্রায় শোনা পালা থেকে নিজের ভাণ্ডার উজাড় করে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করে ক্ষুদিরাম। অনেক গল্প শোনা হল। শুনতে শুনতে মনে হল—এমন নির্লোভ দেবতা—দেবরাজ্যেও দুটি নাই। যে দেবতা ইচ্ছে করলে জগৎ তৈরী করতে পারে—জগতের সব সম্পদ দিয়ে রাজবাড়ী ভরিয়ে, সেই রাজবাড়ীতে সোনার পালঙ্কে শুয়ে নিদ্রা দিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে—সে কিনা শ্মশানেই পাতল আস্তানা! প্রায় উলঙ্গ হয়ে একখানা বাঘছাল কোমরে জড়িয়ে কানে ধুতরো ফুল গুঁজে—গায়ে ছাইভস্ম মেখে—জটায় সাপ বেঁধে আর গলায় হাড়ের মালা ঝুলিয়ে মনের আনন্দে শিঙ্গা বাজিয়ে হরিনাম গান করছে! বাহনও একটি বুড়ো ষাঁড়—আহার গাঁজা ভাঙ আর সামান্য ক্ষুদকুঁড়ো যা কিছু জোটে। এ দেবতা সব ত্যাগ করে মানুষকে দেখাচ্ছে—দেখ রে দেখ, এতেও কত আনন্দ। তোরা দু'হাতে টেনে টেনে জড়ো করছিস,—ভাবছিস—কত সুখ—কত আনন্দ! আমি দু'হাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছি সে সব—তাতেই কি আনন্দ কমছে রে?

ক্ষুদিরাম বলল, ঠাকুরমশাই বলে—তিনে এক—একে তিন। বলে না কথায়—জন্ম মিত্যু বিয়ে—তিন দেবতা নিয়ে। শিব হল গিয়ে মিত্যুর দেবতা। মিত্যুটা ভয়ের নয় বলেই—এমন সহজ দেবতা রে, ওর কোথাও ঘোরপ্যাচ নেই।

আমি সন্ন্যেসী হব—শিবকে পূজো না করলে আমার পাপ কাটবে না—ক্ষুদেদা।

॥ কুড়ি ॥

ফাল্গুন শেষ হয় হয়—দোলের পরব আসছে। ওই এক পরব। আবীর মাখিয়ে রং ছুড়ে বাজীপটকা পুড়িয়ে গ্রাম তোলপাড় করা।

দোলের পরব—সে-ও ঠাকুর-দেবতা নিয়ে, কিন্তু মানুষের ঘরে বিশেষ করে কালনায় ক'টা ফাল্গুনের স্মৃতি এখনও মনে উঠলে জ্বালা করে সর্বাঙ্গ। ছেলেমেয়েদের কাছে যা নির্দোষ আমোদ—আর বড়দের কাছে তারই মানে অন্য রকম।

শীত যায়-যায়-কালে এ পরবে মন মেতে ওঠে অকারণে। অকারণেই কি ? তাহলে আকাশের চেহারা কেন বদলায়—বাতাস কেন উত্তর থেকে দক্ষিণে মুখ ফেরায়, গাছে কেন নতুন পাতা গজায়—সবুজ ডালে ফুল ফোটে কেন রাশি রাশি ? কেন নানান বর্ণের পাখী ডাকে নানান সুরে, কেন মনে ধরে খুসীর রং ?

নীলের সন্ন্যাস নেবে—আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে আশু। একখানা কাপড় আর চাদর কিনে গেরুয়া রং দিয়ে ছুবিয়েছে, একটা ছোটমত ত্রিশূল গড়িয়ে এনেছে কামার-বাড়ী থেকে। যোগাড় করেছে গাওয়া ঘি, আলোচাল আর মটর ডাল। ভিক্ষে করে চাল যোগাড় করে সন্ন্যাসীরা—সে পারবে না আশু। কোথায় যেন বাধছে।

বেচাকালী বার বার বলেছে, হাঁরে পারবি তো উপোস করতে ?

উপোস কেন—হবিষ্যি করব তো ?

ওই হ'লো—আলোচাল—মটর ডাল, একটু ঘিয়ের ছিটে—ওতো উপোসেরই শামিল। আমার তো আলোচালের ভাত খেলে মনে হয়- খাওয়া হল না।

পারব পিসি—দেখই তো।

আয়োজন সম্পূর্ণ—পরশু থেকেই আরম্ভ হবে নীলের ব্রত। সকালবেলায় ঘরের মধ্যে কাঠের বাক্সোটা নামিয়ে জমানো টাকার হিসাব করছে আশু—ছুটতে ছুটতে কালীপদ এলো।

আশু, শীগ্‌গির আয়—সব্বনাশ হয়েছে রে! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কালীপদ।

কালীপদ একা নয়—ওর পিছনে বিশ্বিনাথ, পুঁটিরাম; গুপীও সব শেষে।

বাক্সোটা কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে বাইরে এলো আশু।

ওরা সবাই এক সঙ্গে কলরব করে উঠলো, ওরে সব্বনাশ হয়েছে রে—চন্দর-খুড়ো আত্মহত্যে করেছে! কাল রাত্তিরে আমরা তাস খেলে বাড়ী গেলাম—রাত একটা হবে। তারপর ভোররাতেই খুড়ীর গলা পেলাম। কাঁদছে—ডুকরোডুকরি করে কাঁদছে।

আশু পাংশু মুখে শুধোল, গলায় দড়ি দিয়েছে বুঝি?

না রে—ক্ষুর বসিয়েছে গলায়। একেবারে এপার ওপার। উঃ—সেকি রক্ত! থই থই করছে ঘরের মেঝে—মাদুর। দারোগা আসবে এখুনি। চ যাবি নে?

না। মাথা নাড়ল আশু।

সেকি রে—যত শত্তুরই হোক—মরলে মানুষের সঙ্গে সব শেষ। এখন খুড়ীকে নিয়ে টানাটানি করবে দারোগা—ওকে রক্ষে করতে হবে তো?

না। প্রবলবেগে মাথা নাড়ল আশু।

ওরা চলে গেল। আশু ভাবতে লাগল—না গিয়ে ভাল করলে কি? চন্দর-খুড়োই তাকে সর্বনাশের পথে প্রথম টেনে নিয়ে গিয়েছিল—একথা সত্য, তার নিজের মনেও পাপ লুকিয়ে ছিল না কি? কাঠের মধ্যে আগুন লুকিয়ে থাকে। কেউ দেখতে পায় না বলে আগুন কি থাকে না? তা যদি না থাকত

একটা দেশালাই'এর কাঠি জ্বেলে ধরলেই কাঠ কেন জ্বলে ওঠে? কেন ইঁট জ্বলে না—পাথর জ্বলে না? না—শেষ দেখাটা দেখেই আসি। হাজার দোষী হোক—ওই আমাকে স্থিতু করে দিয়েছিল বাজারে। এ রাজ্যের অনেক খবর ওর কাছ থেকেই পাওয়া।

চন্দর-খুড়োর বাড়ির গলিটা লোকে লোকারণ্য। এত মানুষও গাঁয়ে ছিল! সবাই কিন্তু গাঁয়ের মানুষ নয়—দূর দূরান্তর গ্রাম থেকেও লোক এসেছে। এখনও আসছে কাতারে কাতারে। এ রকম উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা পাড়াগাঁয়ে ক্বচিৎ ঘটে। নানা রকম গুজবও রটেছে ইতিমধ্যে।

নিজে আত্মহত্যা করেছে—না গলা কেটে দিয়েছে?

নিজে কেউ অমনি করে গলা কাটতে পারে নাকি! শুনছি বউটার স্বভাব-চরিত্তির ভাল ছিল না— তারই লোক—

বউটা কি করছে?

সে টাকাকড়ি গহনাপত্তর নিয়ে সট্‌কেছে।

তাহলে তারই কাজ। উঃ—কলিকাল আর কাকে বলে!

তখনও দারোগা আসেনি। চন্দরের জানাশোনা লোক এরা, বাড়ীর মধ্যেই গেল।

ক্ষুদিরামকে একান্তে ডেকে আশু বলল, চন্দর-খুড়োর বউ নাকি পালিয়েছে?

হাঁ।

তবে যে কালীপদরা বলছিল—ভোরবেলাতে খুড়ীর কান্না শুনতে পেলাম।

ক্ষুদিরাম বলল, কান্না ঠিকই শুনেছে—খুড়ীর নয়—চন্দরের দূর সম্পর্কের পিসতুতো বুন দক্ষিণ পাড়ায় থাকে না—সেই কাঁদছিল।

এত ভোরে সে খবর পেল কি করে?

শোন তবে। উঠোনের একধারে আশুকে টেনে এনে ক্ষুদিরাম চাপা গলায় বলল, আজ তিন দিন হ'ল খুড়ী নবদ্বীপ

যাচ্ছি বলে—উধাও। গহনা-পত্তর তো পরেই ছিল—টাকাকড়ি কিচ্ছু বাক্সে রাখেনি।

একলা গেল? অবাক হয়ে শুধোল আশু।

ক্ষুদিরাম মুচকি হেসে বলল, একলা কখনো যায় ওরা! ছিরু শা'র ছেলে বীরু আছে সঙ্গে। সেই তো ইদানিং আসা যাওয়া করছিল।

খুড়ো জানত?

জানে বইকি—খুড়োর উপার্জ্জনে পেটের ভাত যদি হতো পরনের কাপড় জুটতো না। ওর এক গা গহনা, ভাল ভাল শাড়ী ...হাতী পোষার খরচ—সাধ্যি কি যোগায় খুড়ো। থাকগে এসব কথা! খুড়োকে শেষ দেখা দেখে আসি চ।

শেষ দেখা না দেখলেই ছিল ভাল। রক্তগঙ্গার মাঝে সেই বীভৎস দৃশ্য, অস্তিমশয়ানে প্রেতের মত বিকট মূর্ত্তি—সারারাত দু'টি চোখের পাতা এক করতে পারল না আশু। মৃত্যু এত নিদারুণ--এমন কুৎসিত বেশেও আসে!—শিব নাকি মঙ্গলময় —শ্মশানচারী—মৃত্যুর নিয়ন্তা। তাঁর রাজ্যে এমন কুৎসিতকে কে কল্পনা করতে পারে!

দারোগা তদন্ত শেষ করে রায় দিয়ে গেছেন—আত্মহত্যা। তবে নবদ্বীপে পুলিসের কাছে রিপোর্ট গেছে—আরও যদি কিছু তথ্য পাওয়া যায়। চন্দরের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা কানে এলো—কিন্তু কি লাভ সে আলোচনায়! যে চলে গেছে পৃথিবী থেকে—সেতো সব কথাই শেষ করে দিয়ে গেছে। দু'চারদিন তাকে নিয়ে আলোচনা হবে—তারপর সবাই ভুলে যাবে। ভুলে যাওয়াই রীতি। এই যে মা চলে গেছেন প্রায় দেড় বছর— তাঁর কথা কতটুকু ভাবে আশু? কখনো কোন কর্মহীন সন্ধ্যায় ঘরের দাওয়ায় বসে বেচাকালী উচ্চগলায় শোকের সুর তুললে তাঁকে স্মরণ হয়—সারাদিনের মধ্যে তাঁর কথা কেউই বলে না

তো। সেই সময় মনে হয়—মা ছিলেন বটে। তাঁর চেহারাটা মনে হয় না—কথাগুলোও কানে বাজে না- শুধু প্রাণের মধ্যে স্নেহের একটু উত্তাপ যেন জমে আছে। বেশীক্ষণ ধরে ভাবলেই ওটা বোধ হয়।

যাক, আজ থেকে সন্ন্যাস সুরু। সকালে উঠে গঙ্গায় স্নান সেরে শিবমন্দিরে ব্রত গ্রহণ করতে হবে। শিব মঙ্গলময়—মঙ্গল করুন সকলের।

॥ একুশ ॥

চৈত্র যত শেষের দিকে এগিয়ে আসে—রৌদ্রের খরতাপ ততই খরতর হয়। সমুদ্র মন্থনের উগ্র হলাহল—তিন ভুবনে আগুন জ্বালিয়ে ধেয়ে আসে। উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে নূতন সন্ন্যাসীর দল। জয় শিব শঙ্কর—হর—হর। ব্যোম ভোলানাথ।

শিবকে মাথায় করে দু'ক্রোশ দূরে গঙ্গায় স্নান করতে যায় সন্ন্যাসীরা। সকালে একবার—বিকালে আর একবার। মুখে চিৎকার করে, জয় শিব-শঙ্কর—দেব-দেব মহাদেব। একটা ঢোল আর একটা কাঁসি বাজে—পিছনে পিছনে চলে এক-পাল অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়ে। ওই সব-ভোলার দলই ভোলানাথের আপন, প্রিয়জন।

কাঁটা সন্ন্যাসের দিন ওদের ভিড় বাড়ে—আগুন-সন্ন্যাসী দেখতেও ওরা ছোটে। আর চড়কের দিন তো কথাই নাই। ভেঁপু বাঁশী, মাটির পুতুল, বঁটি, পাঁপর ভাজা, কাঠের চোঙায় দড়িটানা বাঁদর একটা না-একটা সংগ্রহ করেই ওরা। তবে চড়কের সে অগ্নি-পরীক্ষা আইন করে উঠিয়ে দিয়েছে সরকার। তীক্ষ্ণমুখ বঁইচি কাঁটায় গড়াগড়ি খেয়ে কি জ্বলন্ত আগুনের মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এসে—মহাদেবের মাহাত্ম্য প্রচার

করার দিনও আর নাই। কাঁটার উপর আলগোছে বুক ঠেকিয়ে, আগুনকে দূর থেকে প্রণাম করে—পিঠে গামছার সঙ্গে দড়া জড়িয়ে বেঁধে চড়ক-পাক খেয়ে নিয়মগুলি পালন করা হয়।

ফল-ভাঙ্গার দিন—কি খাতির! আমার গাছের এই এঁচোড়টা নিয়ে যাও সন্ন্যেসী-ঠাকুর—পেরথম ফল গাছের। এই আমগুলো ধর তো, গাছে বোল ধরে ঝরে ঝরে পড়ত—এবার বাবাকে মানত করতে আম দিয়েছেন ঢেলে। এই নেবুটা—বেলটা—কলাটা···সবই বাবার দয়া।

এ বাড়ীতে এসো তো সন্ন্যেসী-ঠাকুর—দুধ দিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে চান করাবো বাবাকে। পরিষ্কার একটি পিতলের থালায় লিঙ্গমূর্ত্তি বসিয়ে দুধ ঢেলে—গঙ্গাজল ঢেলে স্নান করিয়ে নূতন গামছা দিয়ে মুছে দিতে হয় গা। সবাই জয়ধ্বনি দেয়, জয় বাবা মহাদেব—দেব দেব মহাদেবের—চরণে সেবা লাগে।

ডুম ডুম করে ঢোল বাজে—কাঁই-নানা কাঁই-নানা সুর তোলে কাঁসি। একবাড়ী থেকে আর এক বাড়ীতে যান মহাদেব। পিছনে সেই অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল।

রৌদ্রজ্বালাময় চৈত্র শেষ হ'ল। পৃথিবীর যত ক্লেদ আবর্জনা রুদ্রের তীব্র দৃষ্টিতে দগ্ধ হয়ে গেল। নূতন শ্রী নিয়ে এলো নূতন বছর।

চড়ক ও ভগবতী-যাত্রা—ব্যবধান সামান্য কয়েকটি দণ্ডের। অথচ এইটুকুর মধ্যেই সংহারের লীলাবৃন্তে সৃষ্টির ফুল ফুটতে সুরু হয়। একটি দিনেই চৈত্রের রুক্ষপ্রান্তরে শ্যামলের সমারোহ নেমে আসে। প্রতিটি গাছে নূতন জীবনের বার্তা—নূতন আয়ু আর আনন্দ নিয়ে বৈশাখের আবির্ভাব। এসব যদিও একদিনে আসে না—বৈশাখের শুভারম্ভে নূতন বছরকে নূতন চোখ দিয়ে দেখে সবাই।

আশুও নূতন জীবনে প্রবেশ করল। রঘুনাথপুর আরও কাছে এলো—কাছে এলো চতুর্দশী উমাকালী।

॥ বাইশ ॥

এসব দিনের তুলনা হয় না। নিজের ঘরে অপরিচিত একটি মেয়ে এলো—তাকে ঘিরে পুরোনো ঘর নূতন হয়ে উঠল। পুরাতন সংসারে নূতন গৃহ প্রবেশের উৎসব। এতদিন সংসার মা পিসির হাতে ছিল– তার রূপটা তেমন স্পষ্ট ছিল না। ওদের ইচ্ছা দিয়ে তৈরী জিনিসটি—ওদেরই ছিল অন্তরের জিনিস—একান্ত আপন করে পাওয়ার স্বাদ তার মধ্যে অনুভব করেনি আশু। উমাকালী বদলে দিল স্বাদ। পিসির ছায়ায় থেকেও—ফুলের কলিটির মত স্ফুটনোন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল।

দশহরায় উনুন জ্বালতে নেই—ফলার খেতে হয়। চিঁড়ে এনো। রাত্রিতে মৃদুস্বরে একবারমাত্র উচ্চারণ করে উমাকালী। আশু চিঁড়ে তো আনেই—সেই সঙ্গে আসে ভাল আম—কাঁঠাল মর্ত্যমান কলা। আগে মা পিসি বার বার মনে করিয়ে দিলেও—মনে থাকত না।

রথের মেলায় একখানা পিঁড়ি এনো তো।

পিঁড়ি আসে—শোলার দাঁড়ে-বসা শোলার ময়নাও আসে একটি। আর আসে ভাল একখানা বঁটি।

বঁটি আনতে বলিনি তো?

সেদিন দেখলাম—পুরোনো বঁটিতে কুটনো কুটতে পারছ না।

পুরোনো বঁটিখানা পুড়িয়ে নিয়ে এসো কামারবাড়ী থেকে। ওতেই এখন দু'জন্ম কেটে যাবে। এটা তোলা থাকবে—কাজে-কম্মে বার করব।

এবার পুজোয় কি কাপড় নেবা?

যা দেবা তুমি।

শান্তিপুরী জরিপাড় একখানা মনে করছি—

অত দামের কাপড় কি হবে—তার চেয়ে একজোড়া কলের কাপড় দিও।

তা হোক—তুলে রাখবা বাক্‌সোয়। কোথাও যেতে আসতে—এই ঠাকুর দেখতেও তো যাবা।

বাবাও শুনচি কাপড় দেবে। তোমাকে আমাকে পিসিকে।

অন্যের কাছে ও যে কমদামী নয় এটা আরও একবার পরখ করেছিল আশু। দশহরার আগে জামাইষষ্টিতে শাশুড়ী নিমন্ত্রণ করেছিল। পাটভাঙ্গা জামা-কাপড় পরে—গায়ে এসেন্স ঢেলে—পাম্পশুটাকে তেল চকচকে করে--দশ মিনিট ধরে পরিপাটি একটি টেরি কেটে আশু রঘুনাথপুরে গিয়েছিল। সে কি খাতির--কি যত্ন! ফুলকাটা আসনে বসিয়ে—নানা রকম মিষ্টি সাজানো থালাটা সামনে ধরে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল শাশুড়ী! ছেরজীবী হও বাবা—আমার মাথায় যত চুল—

দু'টি টাকা দিয়ে প্রণাম করেছিল শাশুড়ীকে—শাশুড়ী দিয়েছিল একখানি ইস্কাপনের টেক্কা-পাড় শান্তিপুরী ধুতি। আশুর মনে হয়েছিল—পৃথিবীটা স্বর্গ ছাড়া আর কি!

সেই স্বর্গে বাস করছে আশু।

উপার্জনে মন বসেছে আরও। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাল কেনা-বেচার বিরাম নাই। কখনও কালনায় ছুটছে কখনও কলকাতায়। চারপাশের চাষী-গ্রামগুলি তো আছেই। বাজারের সেরা জিনিস আশুর কাছেই পাওয়া যায়—দামও বেশী আদায় করে।

ছোঁড়াটার মাথা আছে। পুঁটিরাম বলে। জিনিস চিনতে দর-দস্তুর করে কিনতে ওস্তাদ! আবার পালপাব্বনের হিসেবও রাখে।

শুনছি—ওর বউটা খুব পয়মন্ত। বদ্যিনাথ জবাব দেয়।

মা বলছিল—যখন ক'নে হয়ে ভিটেয় পা দিল--ওর পিসি এক কড়া দুধ জাল দিচ্ছিল—দুধটা উথলে পড়েছিল।

দূর গাধা—ওটা মেয়েলি আচার,—ইচ্ছে করেই করে। কালীপদ হেসে উঠল। আমার বউ যখন আসে তখনও শুনিতো দুধ উথলে আকা নিবে গিছল! আজ দেখেছিস তো রান্নাঘরের দশা—সবদিন আকা জ্বলে না!

তা যাই বল—রেশো নাকি জমিয়েছেও কিছু। শুনচি নতুন বাজারে আর বসবে না। গঞ্জের বাজারে—ওই মুদি দোকান ময়রা দোকান পান-বিড়ি-হাঁড়ীকলসীর দোকান আছে না? সেই সব দোকানের পাশে একটা তরকারির দোকান করবে।

দোকান করবে···তরকারীর! সে আবার কেমন? গুপী হাসল।

কলকাতায় দেখিস নি? পচ্ছিমে তো যাসনি কোন জন্মে, গেলে দেখতিস সেখেনে ওই রকমই সব দোকান। দিনরাত খোলা থাকে বিক্রি হয় হু-হু করে। আমাদের মত মাটিতে বসে খদ্দেরের পানে হাঁ করে চেয়ে থাকে না। বদ্যিনাথ বলল।

গুপী পানের পিচ ফেলে হেসে উঠল—ভারি তো একবার কাশী গিইছিলি—তারই গুমোরে মরে যাচ্ছিস! ওখানকার পায়খানাটাও ভাল!

ভালই তো। রুখে উঠল বদ্যিনাথ।

থাম বাপু—। ঝগড়া বাধবার মুখে পুঁটিরাম থামিয়ে দিল। কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, তা'লে নতুন হাটেও বসবে না বল?

নতুন হাটে না বসবে যদি তো দোকানদার কিসের! শুনছি চন্দর-খুড়োর চালিটা যোগাড় করেছে।

আহা—খুড়োর আমাদের কি অপমিত্যুটাই না হলো! খুড়ী যদি অমন দাগাটা না দিত—গুপী কপট নিঃশ্বাস ফেলল।

থাম থাম, তোরা আর সাধুপুরুষ সাজিস নে! বদ্যিনাথ ধমক দিল। আমরাই কি কম পাপের ভাগী!

হরি হরি বল! পুঁটিরাম রসালো কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

॥ তেইশ ॥

আবার ঘুরে এলো চৈত্রমাস—নীলের ব্রত, গাজনের উৎসব। আশু বলল, এবারও সন্ন্যেসী হব পিসি—দু'হপ্তার জন্মে।

বেচাকালী বলল, নাই বা নিলি—বউ তো নীলের উপোস দেবেই।

না পিসি,—বোঝ না…শিব-ঠাকুরের দয়ায় যাহোক দু'পয়সা কামাচ্ছি—ওনাকে তুষ্টু রাখতে হবে বইকি।

সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম—হবিষ্যান্ন গ্রহণ কম্বলাসন শয্যা—আবার মেয়েদের সঙ্গে এক ঘরে সে শয্যা পাতলে হবে না। গেলবার ব্রতের কঠোরত্ব বোধ করেনি আশু। এবারে পনেরো দিন তো নয়—পনেরোটা বছর মনে হচ্ছে। সেই ফল-ভাঙ্গা কাঁটা-সন্ন্যাস আগুন-সন্ন্যাস—চড়ক পাক খাওয়া যথানিয়মে হল। ব্রত-উদ্‌যাপন করে আশু বলল, আঃ!

উমাকালী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে পা টিপতে বসল।

আঃ…ও আবার কি! পায়ে সুড়সুড়ি লাগে যে! পা টেনে নিলে আশু।

পাঁচ দশ মাইল হাঁটা পা টন টন করলেও কেউ টিপে দিক এটি কখনও মনে হয়নি। উমাকালীর নরম হাত সেই কড়া ফাটা-ফাটা পায়ের উপর পড়লে গা পর্যন্ত শিউরে ওঠে—কেমন সুড়সুড়ি লাগে, ঘুম আসে। কি তৃপ্তি—কি আরাম! আশুর সামান্য কষ্টও আর একজনের বুকে কত বড় হয়ে না বাজছে।

ভাবতে ভাবতে আরও অনেক কথা মনে পড়ে। তখন প্রথম নেশা ধরেছিল চোখে—ডালিমকে প্রাণের চেয়ে দামী বলে মনে হয়েছিল। ডালিমও বলত, তোমার জন্য সব করতে পারি।

একদিন বাজার-বেলায় চড়া রোদ লেগে মাথাটা ধরেছিল।

বিকালে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছিল। ডালিম তখন আরশি চিরুনি গন্ধতেল নিয়ে চুল বাঁধতে বসেছিল। ও বিছানায় শুয়ে উঃ-আঃ করছিল। ডালিম অনেকক্ষণ ধরে চুলই বাঁধছিল।

যন্ত্রণার চোটে একসময়ে চীৎকার করে উঠেছিল আশু, একটুখানি মাথাটা টিপে দাও না গো—গেলাম যে!

ডালিম উত্তর দেয়নি সরাসরি, আপন মনে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, ভাল জ্বালা—দু'দণ্ড সুস্থির হয়ে চুল বাঁধবার যো কি! টিপটা তেড়ে-বেঁকে গেল! যাবে না—অত টিক্-টিক্ করলে কখনো—

আমি যে মরে গেলাম। চুল না হয় তাড়াতাড়ি বেঁধে নাও। কাতরস্বরে বলেছিল আশু।

আহা মরিরে—কি আমার গা-জল-করা কথা! আমি কি তোমার ঘরের মাগ যে দাসীবিত্তি করব—সেবা করব? আশা-আহিখ্যেও কম নয়! মুখ ঝামটা দিয়েছিল ডালিম।

কথাটা ভুলতে পারেনি আশু। দেহের সঙ্গে দেহ মিশিয়েও কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেল—অনুক্ষণ মনে হয়েছে। আশ্চর্য, এমন একটা প্রবল টানেও মন ভেড়ে না মনের কিনারায়? ওরা মানুষ নয়—যন্ত্র। সেকথা বলেওছিল একদিন।

তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠেছিল ডালিম।

এটা বুঝি নতুন বুঝলে নাগর! তোমার সঙ্গে সম্বন্ধটা তো এই রূপ-যৈবনের। এ যেদিন থাকবে না—আমার ছেঁয়া মাড়াবে কি! এঁটো পাতার মত ছুড়ে ফেলবে ওই নয়নজুলিতে। এ হল আরশির মুখ দেখা। বলে সুর ধরেছিলঃ

ফেল কড়ি মাখ তেল
তুমি কি আমার পর?

ঘা লেগেছিল বইকি—মোহঘোর ভাঙ্গে নি। ওরা মেয়ে—এরাও মেয়ে। কত তফাত! এখানে দেহটাই বড় নয়—টাকার

দামও বেশী নয়। এখানে একটি জিনিসই দামী। এই সংসার। দু'জনের অনেক আশা—অনেক সাধ—অনেক কল্পনা এর ছোট দেওয়াল-ঘেরা জমিটুকুতে ফুল ফুটিয়ে চলেছে। উপার্জন বাড়লে আর একখানা ঘর উঠবে, কূয়োর বদলে হবে ইঁদারা, একটি গাইগরু, ছাগল গোটা দুই তিন, হাঁসও কিছু, গলায় সোনার চিকন হার একগাছি···অসংখ্য অগুন্তি সাধ। দু'জনের সাধ-আশার রঙে প্রতিদিনই তুলিটা ভরে ভরে উঠছে। ছবি তৈরী না হোক—তুলির রং ভরছে—শুকোচ্ছে—একদিন-না-একদিন ছবি হয়ে কল্পনা হবে সার্থক।

নীলের দিন উপোস করল উমাকালী। বৈকালে ক্লান্ত আশু দাওয়ায় শুয়ে দেখল ওর কচি মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, চোখের কোল দু'টো বসা-বসা। এত অল্প বয়সে এই ব্রত না করলেই বা কি হতো!

সন্ধ্যার আগে বেচাকালী দাওয়ার নীচে থেকে ছড়া কাটল :

নীলের ঘরে দিয়ে বাতি।
জল খাওসে পুত্রবতী॥

এখনও পুত্রবতী হয়নি উমাকালী। হবে তো—তারই আগমনী গান।

তেমনি শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে আর একটি ব্রত পালন করল বেচাকালী। সংসারের কল্যাণের জন্য বনভোজন আর সামনাই। সেদিনও মনসা পূজা—প্রায় অরন্ধনের পর্ব। এবেলা উনুন জ্বলবে না—চালভাজার ফলার খেয়ে বনভোজন করবে বেচাকালী। বন কোথায় বাড়ীতে? কেন তুলসী আর নিম গাছে যেখানটায় অল্প ছায়া পড়েছে উঠোনে—একটি বোম্বাই আমের চারা আধতলা সমান মাথা তুলেছে—তার চেয়ে বন-ভোজনের ভাল জায়গা আর কোথায়?

দুপুর বেলায় সেখানে বন-ভোজন হল।

ভোজন সারা হতে না-হতে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাটির প্রদীপটি জ্বেলেছে উমাকালী।

দাওয়ার একধারে শুয়ে বন-ভোজন-পর্ব দেখছিল আশু। দেখল বেচাকালী দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল :

ঘরে কেন আলো ?

ঘরের ভিতর থেকে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল উমাকালী : গিন্নী গেছেন বন-ভোজনে বাড়ীর সবাই ভাল।

বেচাকালী প্রশ্ন করল, বাড়ীর সবাই ভাল ?

উত্তর এলো : ভাল—ভাল—ভাল।

এমনি করে এরা সংসারটিকে ব্রত পূজা উপবাস পার্বনের নিয়মে বেঁধে সুন্দর করে তুলছে।

আশ্বিনে মহামায়ার পূজা। দুর্গা ষষ্ঠী আর মহা-অষ্টমীতে উপবাস।

বেচাকালী বলল, পর পর দুটো উপোস সহ্যি হবে না বউ— অষ্টুমীটা বাদ দে না হয়।

না পারব।

তুই যেন পারলি—ওটার যে অনিষ্ট হবে—যেটা পেটে রয়েছে।

দাওয়ায় শুয়ে তন্দ্রামত আসছিল আশুর, ভাবছিল কাল কালনায় গিয়ে কিছু বেশী করে আলু আনব। এবার দুর্গাপূজায় দাম চড়বে আলুর। এইবেলা কিনে রাখলে মোটা লাভ।

কথাটা কানে যেতেই হঠাৎ জ্যামুক্ত ধনুকের মত উঠে বসল। কি বলছে ওরা ? সংসার সুন্দর হয়ে উঠবে তারই কথা কি ? ইচ্ছে হচ্ছিল চীৎকার করে চেঁচিয়ে ওঠে—চেঁচিয়ে বলে, হে শিব, তুমিই সত্য—তুমিই সুন্দর। জয় জয় দেবাদিদেব মহাদেবের জয়।

ঘরে পিসি রয়েছে। অনেক কষ্টে উচ্ছ্বাস দমন করল আশু। ছট্ ফট্ করছে—প্রহর গুনছে কখন পিসি পাড়া বেড়াতে যাবে, কখন উমাকালীর নিজের মুখ থেকে শুনবে এই পরমবার্তা।

এই শরীর নিয়েও শিবরাত্রি পালন করল উমাকালী। বলল, শিবের মাহিত্তির বল—শুনব।

এই ছ্যাখ কাণ্ড—আমি মুক্‌খু মানুষ—শাস্তর জানি!

না—বল।

অগত্যা ক্ষুদিরামের মুখে শোনা গল্প আবৃত্তি করলে।

জানিস তো, মা-দুর্গার সঙ্গে শিবের পেরাই কোঁদল হয়, মা হলেন সংসারী মানুষ। এসোজন বসোজন কুটুমসাক্ষেৎ ঠেকাতে ঠেকাতে মেজাজটা ঠিক থাকে না। শিব আমাদের ব্যোম-ভোলানাথ--খাই-দাই-কাঁসি বাজাইগোছ মানুষ। কিসে কি হয় অত খোঁজখবর রাখেন না। এই সংসার চালানো নিয়ে একদিন ঝগড়া। শিবতো না খেয়ে দেয়ে রাগ করে পালালেন বাড়ী থেকে। পালিয়ে অগম বিজন বনে এলেন। তখন সেই বনে হরিণ শিকার করতে এসেছিল এক ব্যাধ! সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যেমুখো একটা হরিণ পেল শিকারে। কিন্তু বনে তখন অন্ধকার হয়েছে। কেষ্টপক্ষের চতুর্দশী—পথ চিনে গ্রামে যাওয়া যাবে না আর। বাঘ ভালুকের হাতে পড়বে ভেবে ব্যাধ একটা বড় বেল গাছের উপর চড়ে বসল। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ব্যাধ গাছের ওপরে বসে ভাবছে তার বউ ছেলের কথা। তারা দু'দিন ধরে উপোসী আছে। আজও কিছু জুটল না। যদি আজ বাড়ী ফিরতে পারত! ওদের কথা মনে হতেই দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। এখন শিবঠাকুরও ঘুরতে ঘুরতে এসে বসেছেন সেই গাছতলায়। সারাদিন উপোসী তো, ওঁর প্রাণটা খিদেতেষ্টায় টা-টা করছে। গাছের ওপরে বসে কাঁদছিল ব্যাধ—ওর চোখ থেকে জল পড়ছিল তো—সেই জল দু'তিনটে পাকা বেলপাতার

ওপর পড়তেই—জলের ভারে পাতাগুলো খসে শিবঠাকুরের মাথায় পড়ল। যেমন পড়া—শিবঠাকুর আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, কেরে ভক্ত—আমায় পূজো করলি? সারাদিন উপোস দিয়ে আছি—তোর পূজো পেয়ে ভারি তৃপ্তি হ'ল। বর নে। দেখছিসতো—কত অল্পে তুষ্টু দেবতা! তাঁর বরে ব্যাধের দারিদ্দির ঘুচলো—বাড়ী ঘরদুয়োর উঠলো। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল।

আর নীলের কথা? উমাকালী শুধোল।

সে আরও পেল্লায় গপ্প—আর একদিন বলব।

না—এখনই বল। আশুর পিঠে অল্প ঠেলা দিল উমাকালী।

দেখদিকি কাণ্ড—আমায় যেন কথকঠাকুর পেলি!

কথকঠাকুরই তো। আশুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে হেসে উঠল খিল খিল করে।

আশু আধ-শোওয়া হয়ে গল্প বলতে লাগল:

একবার খুব অজন্মা হ'ল স্বগ্গে।

উমাকালী বাধা দিয়ে বলে উঠল, স্বগ্গে অজন্মা! দূর—মা তো বলে সেখানে কাউকে খেটে খেতে হয় না—ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ দিয়ে বসে বসে রাজভোগ খায় সবাই।

আশু শুধরে নিলে, তা'লে পিথিবীতে। ভারি দুদ্দিন—সেই যে বছরকতক আগে হয়েছিল—মনে আছে?

উমাকালী বলল, আমরা তখন জল ডিঙ্গোডিঙ্গি খেলতাম—পুন্যিপুকুর যমপুকুরের বেরতো করতাম, অত মনে নেই।

কি রকম দুদ্দিন জানিস—এই গাছে ফলপাকুড় নেই, ক্ষেতে শস্যি নেই, গরুর বাঁটে দুধ নেই, মানুষের মুখে হাসি নেই। দেবতারা সব ভেবে ভেবে আকাট। কি করা যায়—সবমাই ছুটলো বিষ্টুর কাছে পরামর্শ করতে। উনি তো সবমায়ের বড় দেবতা। বল দিতে—বুদ্ধি দিতে—ভরসা দিতে ওনার মত ওস্তাদ

আর দু'টি নেই। সব শুনে উনি বললেন, এমনটা হয়েছে কেন জান—লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সমুদ্দুরের মধ্যে--তাই। এখন উপায়? উপায় আছে বইকি—সমুদ্দুর মন্থন করে লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

সমুদ্দুর মন্থন? সে আবার কি জিনিস? উমাকালী প্রশ্ন করল।

কি রকম জানিস? যেমন ঘোল ম'য়ে মাখন তোলে সেই রকম। তা অত বড় জিনিস সমুদ্দুর—কূলকিনারা নাই—ওকে মইতে হ'লে—মউনিটিও চাই তেমনি। বিষ্ণু যুক্তি দিলেন, ভাবনা কি—পৃথিবীতে হিমালয়ের মত আর একটা বড় পাহাড় আছে মন্দর পাহাড়—সেইটেকে কর মউনি। দড়িও চাই পেল্লায় লম্বা। কেন, বাসুকিনাগ আছে—তাকে নাও। এখন পাহাড়টাকে দাঁড় করানো হবে কিসের ওপরে? তা সে-ও মিলে গেল। ওই যে অবতার গো—কাছিম—তাকে একটু ধরাপড়া করগা, আছে পাতালে। তোমাদের বিপদ শুনলে অবিশ্যি আসবে। আর অসুরদের সঙ্গে নাও—একা পারবে না—ওনাদের গায়ে খুব জোর আছে তো।

তাই হ'লো—কাছিমের পিঠে পাহাড় বসিয়ে বাসুকিকে বেশ করে জড়ালে সেই পাহাড়ে। তারপর ন্যাজের দিক ধরল দেবতারা—আর মুখের দিক অসুররা। দেবতারা চিরকেলে সেয়ানা কিনা—ন্যাজের দিকটা নিল। মইতে মইতে বাসুকির মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল—অসুর দেবতা দু'পক্ষই কাহিল হয়ে পড়ল। দড়িদড়া ছেড়ে বসে পড়ল সবাই—না আর আমাদের সাধ্যি নেই! তখন বিষ্ণু এগিয়ে এসে ওদের শক্তি দিলেন। ওরা আবার মইতে লাগল সমুদ্দুর। মইতে মইতে উঠলো ঐরেবত হাতী, উচ্চৈঃশ্রেবা ঘোড়া, পারিজাত ফুল, ভাল ভাল মণিরত্ন কত কি। শেষকালে উঠলেন মা-লক্ষ্মী। তখন সবাই-এর ভারি আনন্দ। জিনিস ভাগ করতে বসল।

দেবতার রাজা ইন্দ্র—তিনিই নিলেন ভাল ভাল জিনিসগুলো—হাতী, ঘোড়া, মণিরত্ন সব। বিষ্টুর নক্ষ্মী বিষ্টু নিলেন আর নিলেন একটি দামী মণি। কোস্তভমণি।

এদিকে নারদ কৈলেসে এসে মহাদেবকে নাগালে—ওর কাজই হ'ল কোঁদল বাধানো। বলল, প্রভুগো—দেবতাদের কাণ্ড কারখানা দেখে আমি তো অবাক! সমুদ্দুর ময়ে ভাল ভাল জিনিস যা উঠল সম্মাই ভাগ করে নিল—আপনাকে একবার জানাল না পজ্জন্ত! আপনার কিছুতে নোভ নেই—আহিক্কে নেই—আপনি কি কেড়ে নিতেন ওদের জিনিসগুনো?

শিব হেসে বললেন, তা নিক গে।

মা দুগ্গা সব শুনছিলেন—আর রাগে গরগর করছিলেন। শিবের এই কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, অত ভাল-মানুষ বলে কেউ মানেও না—বুঝলে বাছা নারদ। ভাল মানুষের কাল আর নেই!

তা না মানুক গে। শিব হাসলেন।

এই না যাঁহাতক হাসা—মা দুগ্গা আরও রেগে চিপটেন কাটলেন। নারদকে বললেন, বুঝেছ বাছা—যার গলায় হাড়ের মালা—সে কোস্তভমণি কি করবে? দু'কানে দুটো বুনো ধুতরো ফুল—পারিজাত কি হবে! হাতী ঘোড়া? ওরে বাপরে—একটা বুড়ো ষাঁড়—ঢকর ঢকর করে চললেই ওঁর চতুব্বগ্গ ফল! ভিখিরীকে কেউ পোঁছে নাকি! তেমনি খোয়ার আমারও ওনার হাতে পড়ে। বলে মা দুগ্গা কাঁদতে লাগলেন।

শিবের হ'ল রাগ। কি—আমাকে না বলেকয়ে সব ভাগবাটরা করে নিয়েছে! আচ্ছা দাঁড়াও। ফের সমুদ্দুর মওয়াবো—এবার যা উঠবে সব আমার, কাউকে এক ছিলকে দেব না।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে শিব এলেন সমুদ্দুরের ধারে—পেছুনে

নারদ মজা দেখতে। শিব বললেন, ফের লাগাও। এবার যা উঠবে আমার।

শিবের কথা শুনে ওদের চক্ষু তো চড়কগাছ! দেহে কি শক্তি আছে একবিন্দু! বাসুকির ছালচামড়া ছিঁড়ে রক্তারক্তি। কে মইবে সমুদ্দুর! সবাই মাথা হেঁট করে বসে রইল। ভাবখানা—আর পারব না প্রভু।

মহাদেব ত্রিশূল উঁচিয়ে বললেন, ওঠ্ বলছি ভালয় ভালয়, নইলে—

অমর হলে হবে কি—পেরাণের ভয় সম্মাইকার আছে তো। সম্মাই উঠে বাসুকিকে গুছিয়ে—মার টান হেঁইও—টান জোয়ান হেঁইও—

সমুদ্দুর এমনিতেই তপ্ত হয়েছিল—পাহাড়ের ঠ্যালা খেয়ে জলে আগুন জ্বলে উঠলো। বাসুকির মুখ থেকে বেরুলো আগুন—আর দেবতা অসুরদের গা দিয়ে যে ঘাম ঝরতে লাগল—তাও আগুন। তিন আগুনে মিলে তৈরী হ'ল বিষ। গনগনে আগুনে গলানো লোহার মত গরল—আর ধোঁয়ার মত ঘন—চোখ-ধাঁধানো নীল রং। সেই চাপ ধোঁয়া সমুদ্দুর থেকে ঠেল মেরে আকাশে উঠল—ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারধারে। সব জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল সেই বিষে। চারদিকে হাহাকার উঠল—গেল—গেল—স্বগ্গ মত্য পাতাল সব জ্বলেপুড়ে গেল। দেবতারা হাঁটু গেড়ে বসে স্তবস্তুতি করতে লাগল—বাঁচাও প্রভু—বাঁচাও।

শিব হেসে সমুদ্দুরের ধারে এসে বসলেন। একটি গণ্ডূষে তুলে নিলেন সেই বিষ—মন্তর পড়ে তুলে নিলেন কিনা—সব এসে জমল গণ্ডূষে। তারপর পান করলেন হাসিমুখে। একেবারে খেলেন না—গলায় থুলেন। এমনি বিষ—কণ্ঠ হল নীল। মহাদেবের তো মিত্যু নেই—সব অমঙ্গল ঘুচিয়ে পিথিমীকে আগের মত কল্লে

দিলেন। আবার মাঠে শস্যি হল, গাছে ফলল ফল, গরুর বাঁটে এলো দুধ, মানুষের মুখে ফুটল হাসি।

এমন দেবতা—আহা! উমাকালী আঁচল গলায় দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকাল।

বলল, আমি এবারও নীলের উপোস করব।

আশু বলল, তুই পারবি নে—তোর বদলে আমি বরঞ্চ—

না—আমি করব।

আচ্ছা আচ্ছা, তাই করিস।

উমাকালী উঠে কড়ির আলনার কাছে গেল।

আশু সেদিকে চেয়ে বলল, ওগুনো কি ঝুলছে রে, ফুলতোলা?

উমাকালী সেগুলি হাতে করে ফিরে এসে বলল, কি বল দিকি?

বাঃ—দিব্যি ফুল হাতী ঘোড়া, কে তুলল রে?

কে বল দিকি? চোখ টিপে হাসলো উমাকালী।

তুই—! সত্যি—সত্যি—সত্যি! মা কালীর দিব্যি—সত্যি করে বল।

বললাম তো—এর চেয়েও ভাল ফুল তুলতে পারি। ঝুপ করে সেগুলি আশুর কোলের উপর ফেলে দিয়ে বলল, কোন্‌টা সব চেয়ে ভাল হয়েছে বল্‌ তো?

কাঁথা! অবাক হয়ে গেল আশু। সেই করলিই যদি—এত ছোট্ট ছোট্ট করলি কেন?

তোমার আমার জন্যে করিনি তো। যার জন্যে করেছি—

আশু হা হা করে হেসে উঠলো, সত্যি—গাধা আমি—বুঝতেই পারিনি! তা ক'খানা করলি? এক দুই তিন চার পাঁচ, তা এত কি হবে?

জান তো ভারি! কচি ছেলে—পহরে পহরে দণ্ডে দণ্ডে কাঁথা বদলাতে হবে না? আরও দু'তিনখানা করব।

এবার দোলের মেলায় ঝুমঝুমি আর লাল চুষিকাঠি কিনে

আনব। আর একটা কাগজের ফুল টাঙিয়ে দেব—খোকা হাসবে—হাত নেড়ে নেড়ে খেলা করবে। আশু বল্লল।

দেখ আগে কি হয়—

খোকা। টপ করে জবাব দিল আশু।

যদি খুকী হয়? কৌতুকে মুখ টিপে হাসল উমাকালী।

না, খোকা হবে। ঘটা করে ভাত দেব—কাঁকালে পাটা দেব রূপোর।

ও সব এখন আছে নাকি? হাতে বালা দেব সোনার। খোকা হাত ঘুরিয়ে হাসবে—আর বলব, হাত ঘুরু ঘুরু নাড়ু দেব—নইলে নাড়ু কোথায় পাব!

তু'জনেই হেসে উঠল খিলখিল করে।

এমনি সুখচিত্র আঁকতে আঁকতে ফাল্গুন শেষ হয়ে গেল।

॥ পঁচিশ ॥

চৈত্র এলো। নিরানন্দ চৈত্র। ঝরাপাতার মহোৎসব নিয়ে এলো সে, ফুল ফোটানোর বার্তা দিতে পারল না।

একটি বিকলাঙ্গ ছেলে প্রসব করল বউ। ছেলে পৃথিবীতে এলো—পৃথিবীর আলো দেখলে না।

আঁতুড়ের বাইরে শাঁখ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল বেচাকালী। বলল, কি ছেলে হ'লো গো ধাই-বউ?

রসো—দেখি ভাল করে।—খোকাই হয়েছে গো—কিন্তু—।

শাঁখে ততক্ষণে জোরে জোরে ফুঁ পাড়ছে বেচাকালী।

ঘরের মধ্যে তুর্দ্দান্ত খুশিতে লাফিয়ে উঠল আশু। কেমন, আমার কথা সত্যি হ'ল কিনা!

শাঁখ নামিয়ে বেচাকালী বলল, ছেলে কাঁদছে না কেন ধাই-বউ? ওকে কাঁদা ভাল করে।

আর মা—শুকনো মুখে বাইরে এলো ধাই।—ডাক্তার ডাকাও গো, গতিক ভাল বুঝছি নে।

ওরে রেশো—শোন, আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল বেচাকালী।

তারপর ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি। ডাক্তার এলেন—চেষ্টা করলেন বিধিমতে। ছেলে কাঁদল না—মাই টানল না—চেয়েও দেখল না সংসার।

গম্ভীরমুখে বাইরে এলেন ডাক্তার। আশুকে হাত ইসারায় ডেকে নিয়ে গেলেন উঠোনের একধারে যেখানে বনভোজনের পালুনি করেছিল বেচাকালী—সেইখানে। বললেন, দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করব তোমায়—ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। কিছু লুকোবে না।

আজ্ঞে বলব। শুকনো গলায় বলল আশু।

কোন খারাপ বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে?

আজ্ঞে—লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল আশু।

কখনো খারাপ রোগ হয়েছিল তোমার?

আজ্ঞে—

রোগ সম্পূর্ণ সারেনি তোমার। কেন বিয়ে করেছিলে তবে?

কি উত্তরই বা দেবে আশু! বিয়েটা স্বইচ্ছায় ঘটে না—ওটা প্রজাপতির নির্বন্ধ।

বিয়ে করলে যদি—সাবধান হওনি কেন? জান না—এ রোগের বীজ বয়ে যে সন্তান আসে—সে কানা খোঁড়া বিকলাঙ্গ হয়? তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়। পশু কোথাকার!

মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রইল আশু—মুখ তুলতে পারল না।

উমাকালি খালি কাঁদে আর বলে, হ্যাঁগো—কোন্ পাপে আমায় কানা ছেলে দিলেন দেবতা। দিলেনই যদি—কোল থেকে কেড়ে নিলেন কেন?

এ কেন'র উত্তর জানে আশু,—বউকে বলবার সাহস হয় না।

অনেকদিন শোকাচ্ছন্ন হয়ে রইল উমাকালী। ব্রত পূজা পাল-পার্ব্বন যথারীতি হল বটে—সে সবে আনন্দের স্পর্শ পড়ল না।

আশ্বিনমাসে বেচাকালী বলল, এবার ভাল করে মানত কর বউ—মা বুড়ো-বারাউলিকে মানত কর। মা—আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রাখ—তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেব মা—ষোল আনার পূজো দেব মা।

মাটিতে মাথা কুটে মানত করল উমাকালী।

এবার পুরো সন্ন্যেস নেব বউ। আশু বলল।

দেখ কি হয় আবার। ঐ সময়েই তো—আনন্দ-ওষুদ হলে কি সন্ন্যেস হওয়া যায়?

মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল—ভয়ের ধুক্‌ধুকুনিও সেই সঙ্গে। মা-কে আশুও মানত করেছে। সিদ্ধেশ্বরীকে আর বার্গাচড়ার মা বাগ্‌দেবীকে। পঞ্চমুণ্ডির আসনের ওপর দেবীর ঘটস্থাপনা—বড় জাগ্রত দেবী। আরও ছোটবড় যে কটি ঠাকুরের নাম মনে পড়ল—কি মূর্তি সামনে এলো—তিনজনেই মানত করল তাদের কাছে—পাঁচ পয়সা থেকে পাঁচ সিকের পূজো।

এবার কিন্তু শিবরাত্রির দিন—পুরো দশ মাসও পোরেনি, জীবন্মৃত একটি ছেলে প্রসব করল বউ। এ ছেলেও চোখ বুঁজে রইল—চাইল না মায়ের পানে। তবে কিছুদিন রইল পৃথিবীতে। নিয়মমত পাঁচটি, নত্তা, ষষ্ঠীপূজো হল। ইটখোয়াভরা জমিতে রুগ্ন কুমড়োগাছের মত দু'একটি কটাসে পাতা ছেড়ে একটু যেন বা লতিয়ে জমির কুশ্রীতা ঢাকতে চাইল। তাতে কি মায়ের মন ভরে? চৈত্রের মাঝামাঝি একদিন শুকিয়ে গেল কুমড়ো-লতা।

উমাকালী বেহুঁস হয়ে রইল দু'দিন। দু'দিন পরে যদিবা উঠল—কিছু মুখে দিতে চাইল না। খালি কান্না—খালি কান্না।

হে ভগমান, কোন্ পাপে আমার এমন শাস্তি! কাকে বঞ্চিত করেছিলাম আর জন্মে—এই জন্মে তাই এমন পিতিফল!

আশুও জ্বলেপুড়ে খাক হতে লাগল। মনের অগোচর পাপ নেই—সে জানে কেন এমন ঘটল। মনে পড়ল, যাত্রার দলের সেই গানটা- যেটা বিবেক সেজে প্রায়ই গাইত:

দোষ কারও নয় গো শ্যামা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।

নিদারুণ লজ্জাকে একপাশে ঠেলে ডাক্তারের কাছে ছুটল আশু।

ডিস্‌পেনসারিতে রোগীর ভিড়—আশু একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল।

ডাক্তারের দৃষ্টি পড়ল ওর দিকে। বললেন, কি হয়েছে তোমার?

আশুর চোখকান গরম হয়ে উঠল। কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, আপনি এদের ওষুদ দ্যান—পরে বলব'খন।

ভিড় খানিকটা পাতলা হলে—ডাক্তার বললেন, এস এদিকে।

আজ্ঞে—ওনাদের ওষুদ দেন আগে—

তোমার ব্যাপারটাই শুনি আগে—এসো এসো। ডাক্তার তাড়া দিলেন। আশুর বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল—দু'একজন আধ-চেনা লোক তখনও ঘরে রয়েছে।

ডাক্তার বললেন, জ্বর তো? দেখি হাতখানা।

হাত এগিয়ে দিয়ে আশু আর একটু সরে এলো ডাক্তারের কাছে। প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আজ্ঞে জ্বরজারি নয়—সেই অসুখটা—

কোন্ অসুখ?

চাপা গলায় বলল আশু, সেই যে গেলবার বলেছিলেন—খারাপ জায়গায়—

ওহো! এসো এদিকে—আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে। আশুকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার।

ডাক্তার বুদ্ধিমান—আশুকে লোকলজ্জা থেকে রক্ষা করলেন।

পরীক্ষান্তে বললেন, টাকা খরচ হবে কিছু—দামী দামী ওষুধ ফুঁড়তে হবে, নিয়ম করে চলতে হবে।

আজ্ঞে—যা বলবেন তাই করব।

গোপনে চিকিৎসা চলতে লাগল।

একদিন ডাক্তার বললেন, তুমি তো রোগমুক্ত হলে—তোমার পরিবারকেও ওষুধ খাওয়াতে হবে যে—না হলে সন্তানের শুভ হবে না।

আশু বলল, ওকে কি বলে শুধু শুধু ওষুধ খাওয়াবো! ও শুনলে—

আচ্ছা—যা বলবার আমি বলব।

আশুর মুখে ওষুধ খাবার কথা শুনে উমাকালী বলল, আমার আবার অসুখটা কি! তু'তুটো ছেলে খেয়ে দিব্যি গিলছিকুটছি হাসছি খেলছি বেড়াচ্ছি। বলতে বলতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁপাতে লাগল।

আশু কিন্তু শুনল না—ডাক্তার ডেকে আনল একদিন। উমাকালী কিছুতেই ডাক্তারের সামনে আসবে না—আশুও ছাড়বে না। ঘরের মধ্যে টানাটানি সুরু করল, হেই বউ—তোর তুটি পায়ে পড়ি—একবার আয়। ডাক্তারবাবু কি বলেন—শুনে যা একবার—না হয় নাই খাবি ওষুদ।

বেচাকালী বলল, জনান্তিকে, আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে! ডাক্তার ডাকিয়ে রংতামাসা কেন বাবু! ছোঁড়ার সাধ হয়েছে যখন—করা না চিকিচ্ছে!

ডাক্তার বললেন, বউমা, এধারে এসো—ভাল ওষুধ দেবো যাতে এবার সু-প্রসব হবে—ছেলে নীরোগ হয়ে থাকবে।

কথাটা মনে ধরল উমাকালীর। সুস্থ নীরোগ ছেলে কোল-জোড়া হয়ে থাকবে। হাসবে মায়ের কোলে শুয়ে—আঙ্গুল

নাড়বে—দামালপনা করবে—দুধ খেতে চাইবে না—হাতপা ছুড়ে জ্বালাতন করবে। হামা টেনে টেনে ঘর-উঠোন করবে—বাসন-কোসন ফেলবে—কলকে ভাঙ্গবে—টিকের গুঁড়ো মুখে মেখে ভূতনাথ সেজে খিলখিল করে হাসবে।

একটা ইন্‌জেক্‌সান নিতে হবে যে মা—হাতখানা দেখি।

নিরাপত্তিতে বাঁ হাতখানি বাড়িয়ে দিলে উমাকালী।

আবার স্বপ্ন দেখতে লাগল আশু। কাঁথায় ফুল তুলতে তুলতে একদিন উমাকালী বলল, এবার কিন্তু এখানে থাকব না।

কেন, আমি সন্ন্যেস নেব—

তা নাওগে—আমি এখানে থাকব না। আমিও নীলের বেরতো পালব।

সত্যি বলছি—এবার কোন ভয় নেই। ডাক্তারবাবু বলেছে কোন ভয় নেই। আশু মিনতির সুরে বলল।

না গো, আমার বিশ্বাস হয় না। এ ভিটেয় থাকলে—

কিছুতেই শুনবে না উমাকালী—অগত্যা আশু খুলেই বলল খানিকটা। ভিটের দোষ নয় বউ, আমারই দোষে অমন-ধারা হল।

তোমার কি দোষ? অবাক হয়ে চাইল উমাকালী।

আমার—মানে—এই গিয়ে কথার কথা বললাম একটা। একটা ঢোক গিলে আশু শুকনো হাসি হাসল।

না—না—না—বল তুমি। কেন লুকোচ্ছ কথা?

নারে—কিছুই লুকোইনি। ডাক্তারের ওষুদ আমিও খেলাম তো—তাই। আবার একটা ঢোক গিলে আশু হাসবার চেষ্টা করল।

তুমি কেন ওষুদ খেলে? না বল বিত্তান্ত। উমাকালী উত্তেজনায় আশুর একখানা হাত চেপে ধরল।

মহা ফাঁপরে পড়ল আশু। মনে মনে বলল, এযে দেখছি সাপে

ছুঁচো গেলা হল। কেন মরতে পাড়তে গেলাম ওসব কথা।
না হয় রঘুনাথপুরেই যেতো ও।

আশুকে চুপ করে থাকতে দেখে—উমাকালীর সন্দেহ বাড়ল—কৌতূহল প্রবল হল। বলল, না বল যদি—আমি উঠব না—খাব না—মাথামুড় খুঁড়ে মরব। বলে ঢিপঢিপ করে মেঝের উপর মাথা ঠুকতে লাগল।

আশু তাড়াতাড়ি ওর মাথাটা ধরে ফেলে বলল, আচ্ছা বলছি বলছি থাম। ন্যাটা যখন চুকেবুকে গেছে—শুনে কি যে দু'টো হাত বেরুবে—ভগমান জানে!

তারপর মরীয়া হয়ে এক নিঃশ্বাসে খুলে বলল সব।

সব শুনে বউ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। যেন তাল-গাছটায় এইমাত্র বাজ পড়েছে। গুঁড়ি পাতা সবই ঠিক রয়েছে—ভিতরে ভিতরে পুড়ছে ওর সারটা। জ্বলে জ্বলে গাছটা বুঝি ফোঁপরা হয়ে যাবে!

অনেকক্ষণ পরে উমাকালী বলল, আমি মা'র কাছে যাব।

আশু বলল, আজই তো হয় না। নেয়েধুয়ে দুটো মুখে দাও—তারপর আমি নিজে গিয়ে তোমাকে রেখে আসব।

মাথা নাড়ল উমাকালী। না—এক্ষুণি যাব। এই ভিটের অন্ন পর্শ করব না—কুপিত হবেন নীল। এবার বেরতো পালব আমি—সন্ন্যেস নেব।

ফাল্গুন শেষ হয়ে আসছে—বসন্তের দাক্ষিণ্য এখনও অবারিত। রোজই আমগাছের ডালে দেহ ঢেকে কোকিল ডাকছে—দিনে দুপুরে রাত্রিতে সব সময়েই গলা সেধে চলেছে। পাপিয়ার চোখ গেলও ভারি মিষ্টি। কালও দু'জনে অনেক রাত অবধি বসে বসে স্বপ্নজাল বুনেছে। আশুর কোলে মাথা রেখে মিষ্টি হেসে বলেছে উমাকালী, এমনি করে তোমার কোলে মাথা রেখে সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া বজায় রেখে যেতে পারি একদিন!

আশু ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ধমক দিয়েছে, আবার!

উমাকালী হেসে বলেছে, না গো—সত্যি সত্যি আমার মনে হয়—এমন ভাগ্যি কি হবে!

সেই উমা কঠিন জিদ ধরেছে—এখানে থাকবে না। শ্বশুর-ভিটে—স্বামী-সঙ্গ ওর ভাল লাগছে না! ও ভাবছে শুধু সন্তানের কথা। তাকে নিরাপদ—নীরোগ রাখার কথা।

সব শুনে বেচাকালী বলল, ওমা—এ আবার কি জেদ! খাব না দাব না—যাবই! বাড়ীর বউ মাছভাত মুখে দিয়ে না গেলে গেরস্তর অকল্যেণ হয়—এ জ্ঞেয়ানটুকুও কি হয়নি! কে জানে মা—তোমাদের আচারবিচের তোমরাই জান। কচি খুকি ত নও—ডুলি থেকে এই নামছ না—

একটি ভাত দাঁতে কেটে বলল উমাকালী, আপনাদের অকল্যেণ বাঁচিয়ে চললাম পিসিমা—

ওমা, ওকি কথা! বল, আসি। অতি বড় শত্তুরকেও যাই বলতে নেই। চিবুক ধরে চুমু খেলো বেচাকালী।

আর তো আসব না পিসিমা। মুখে আঁচল চেপে মুখ ফেরালে উমাকালী।

বেচাকালীর চোখেও জল। বলল, ওমা ওকি অলক্ষুণে কথা! তোর ঘর—তোর সংসার—আমি আর ক'দিন! কোলে পুত নিয়ে ভিটে আলো করে বসবি বই কি মা।

আশু জামা পরে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। কোনমতে প্রণাম সেরে গাড়ীতে উঠে বসল উমাকালী।

আশুও-উঠছিল—হাত নেড়ে বারণ করল উমাকালী। তোমাকে আসতে হবে না। এইটুকুন তো পথ—চেনা গাড়োয়ান—আমিই চিনে যেতে পারব।

ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে গোরুর গাড়ী আস্তে আস্তে চলতে লাগল। আশু বজ্রাহতের মত চেয়ে রইল—সেই দিকে।

॥ ছাব্বিশ ॥

সমুদ্র-মন্থনের গোড়ার কথাটাই আজ-কাল মনে পড়ে আশুর। ঐরাবত হাতীতে চেপে মন্দাকিনীর ধার দিয়ে চলেছেন দেবরাজ—আগেপিছে চলেছে আশাশে চোবদার—নকীব—দেহরক্ষীর দল আর অমাত্যেরা। পথে দেখা দুর্বাসা মুনির সঙ্গে। দেবরাজ শ্রদ্ধা জানালেন মুনিকে—মুনি আশীর্বাদী দিলেন মন্দারফুলের মালা। সেই মালা ঐরাবতের শুঁড়ে জড়িয়ে দিলেন দেবরাজ। ঐরাবত শুঁড় থেকে মালা নিয়ে পায়ের তলায় ফেলল। মুনির হ'ল ক্রোধ—আমার আশীর্বাদী মালার এত অপমান! শাপ দিলেন, লক্ষ্মী-ছাড়া হও। সুরপুরীতে লক্ষ্মী ছিলেন অচলা—মুনির শাপে লক্ষ্মী আশ্রয় নিলেন সমুদ্রে—শ্রীহীন হল দেবরাজ্য।

আশুর ছোট্ট সংসারও আজ লক্ষ্মীহারা। আশুও শক্তিহারা। আগে শোলার মত হালকা তরকারির বাজরাটা মাথায় করে বাড়ী ফিরতে কি উৎসাহই না জাগত মনে, এখন শূন্য বাজরাটা মনে হয় বিশমণ ভারি। তখন বাজরায় থাকত নিত্যদিনের বাজার—অন্তত ভাল মাছ কিছু—আজকাল মাছ কিনতে ভুলে যায় আশু। কোন আনাজই সখ করে কেনে না।

বেচাকালী বলে, হাঁরে—না খেয়ে খেয়ে কি দশা হচ্ছে তোর দেখ দিকি! ভাল মাছটাছ আনিস নে কেন?

এই বেশ লাগে।

বেশ না ছাই! খালি আলু আর আলু। অরুচির খাওয়া! আমরা তবু বড়িটা আসটা খাই, হল আমড়া, কি চালতা-কি কাঁচা তেঁতুলের টক—তোরা তো ওসব পাতেই পাড়িস না। একটু দুধই না হয় নে।

কি হবে দুধ?

তা হাঁরে—বউ তো গেছে পেরায় একমাস—খোঁজখবর নে—কে কেমন আছে।

ভালই আছে।

তুই কি হাত গুনতে শিখিছিস ?

না পিসি—মিতের কাছে খবর পাই—তারা ভালই আছে।

মিতে কে র‍্যা ?

ওই রঘুনাথপুরের চাষী একজন—রবি আর বিষ্যুদবারে হাটে আসে। ওর নামও আশু কিনা—তাই মিতে বলি।

বেচাকালী আবার শুধোয়, তা সাদ্দ হবে কি মাসে রে ?

জানিনে। মুখটা ঘুরিয়ে নেয় আশু।

বেচাকালী অবাক হয়ে বলে, জানিস নে কিরে! সাদে একখানা নালপেড়ে কাপড় তো পাঠিয়ে দিতে হবে—পাঁচরকম ভাজাভুজি—

সে ওনারাই দেবে। মুখ না ফিরিয়েই জবাব দেয় আশু।

ওনারা তো দেবেই—আমাদেরও দেয়া কত্তব্য। তুই বাপু ভাল করে খবরটা নিস। আশুর মনোভাব বুঝতে বেচাকালী এধারে ঘুরে আসে।

ফিক্ করে হাসে আশু। খবর নিয়েছি পিসি—, ও নাকি সন্ন্যেস নিয়েছে—হবিষ্যি করছে।

ডান গালে ডান হাতখানা রেখে বেচাকালী যেন আকাশ থেকে পড়ে, ওমা আমি যাব কোথায়! পেটে পো থাকলে সন্ন্যেসি হওয়া যায়! এমন অনাছিষ্টি ভূভারতে তো শুনিনি বাপু। তা তুই বরঞ্চ যা।৮ গিয়ে বারণ কর বউকে—তার বদলে তুই করলেও হবে। যা বাপু—শেষকালে কি হতে কি হবে—তখন ছেরজম্মের খোঁটা খেতে খেতে আমাদের পেরানটা যাবে!

আশুর যাবার ইচ্ছা ছিল প্রবল। তবু যেতে পারেনি। কতবারই ভেবেছে—আজ যাই। গ্রামের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত

গিয়েছেও দু' একবার---তবু যেতে পারেনি। গ্রামের সীমায় সেগুন্‌-বনের পাশে এসে দাঁড়ালেই—ওই সবল সরু শক্ত গাছগুলোর বেড়া নিষেধের আঙুল তুলে ফিরিয়ে দিয়েছে ওকে।

অমনি করেই হাত তুলে বারণ করেছিল উমাকালী গাড়ীতে উঠতে। তখন অভিমানের সমুদ্র ঢেউ তুলেছিল বইকি মনে। উমাকালী একাই কি সন্তানের মঙ্গল কামনা করে? সে সন্তান আশুরও রক্তে-গড়া জিনিস নয় কি? আশু যদি তার মঙ্গল কামনা করে না—তবে একরাশ টাকা কেন তুলে দিলে ডাক্তারের হাতে? কেন দক্ষিণের ঘর তোলা স্থগিত রইল—বাজারের মধ্যে ঘরখানা ভাড়া করা হোল না—গাইগরুর বায়না দিয়ে—টাকাটা হল বাজেয়াপ্ত? একরাশ দেনা মাথায় করে সংসার-সমুদ্রে ভাসলই বা কোন্‌ ভরসায়? ভুল বুঝে গেল উমাকালী। ওর রোগের কথাটাকেই মস্ত বড় দোষের বলে ধরে নিয়ে—আশুকে হেনস্থা করে বাপের বাড়ী চলে গেল।

আগেকার দিনের আশু হ'লে—কি কাণ্ডটাই না বাধত! হয়তো শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে মারপিট করে আসত—হয়তো রাগ করে আর একটা বিয়ে করত—হয়তো—হয়তো···

অনেক কিছু করতে পারত সে। কিন্তু উমাকালী তাকে যে অমৃতের সন্ধান দিয়েছে—আশুর জীবন তাতে অমৃতময় হয়ে উঠেছে। এই ভাঙ্গাচোরা ভিটেয়—একখানি পুরোনো ঘরে মাথা গুঁজে থাকতে পারাটাও পরম সুখের জিনিস বলেই মনে করেছে।

থাক—সেখানে ভালই থাকুক উমাকালী। যাতে সে শান্তি পায় তাই করুক। সন্ন্যাস নিক—পূজা ব্রত করুক—সে যেন শান্তি পায়। ছেলেটি যেন নীরোগ হয়—যেন আশুর বংশধর হয়ে বেঁচে থাকে। একদিন আশু থাকবে না—ওই ছেলেটিই আশুর নাম নিয়ে এই গ্রামের হাটে গিয়ে বসবে। কল্পনার ছায়া-ছায়া রঙটা ঈষৎ স্পষ্ট হয়।

কি খোকা—তোমার নাম কি ?

শ্রীমান······

ভালমত একটা নাম রাখবে আশু। অন্নপ্রাশনের সময় কিছুতেই ওদের রঘুনাথপুরে রাখবে না। ততদিনে দেনা শোধ হয়ে যাবে, হাত ঘুরু ঘুরু সোনার বালা তৈরী করাবে, টাকাও জমবে।

তোমার পিতার নাম ?

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দাস।

সেখানেও আশু। দলিল পরচায় যেমন রয়েছে আশুর বাবার নাম—ঈশ্বর অনন্তলাল দাস—তেমনি ওটিও যে বংশের পাকা দলিল।

তা বেশ চালাক চতুর ছেলে। মাল কেনে দরদস্তুর করে, বেচে খদ্দেরকে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে। বাপকা বেটা।

সেখানেও আশু।

ক্লাসের মাস্টার খাতায় নাম লিখে ভর্তি করে নেবে খোকাকে। তোমার নাম ? পিতার নাম ? সেখানেও আশু।

আবার ঝগড়া-বিবাদে—কোন পক্ষ যদি সাক্ষী মানে খোকাকে —আদালতে হলফ করেও পরিচয় দিতে হবে আশুর। কে বলে আশু থাকবে না ? ছেলের মধ্যে এমনি করে আরও কতকাল অমর হয়ে থাকবে।

॥ সাতাশ ॥

রঘুনাথপুরের আশুকে শুধোয় আশু, হাঁ মিতে, ক'দিনের সন্ন্যেস নিচ্ছে উনি ?

তেনার ইচ্ছে এক হপ্তা—তোমার শাউড়ি বলল, না, মেরেকেটে তিনটে দিন। পেটে যেটা অয়েছেন সেটার পানেও চাইতে হবে তো।

তা'লেও কষ্ট হবে। আশু বলল।

হবে না! এই আমরাই বলে তিনবার তিন পাথর ভাত ঠুসে খাই খাই করি—আর মাত্তর একবার হবিষ্যি—তাও আলো-চেলের ভাত! তুমি যাও মিতে—বউডারে বারণ করগা। ওনাদের কি—মেয়েমানুষের ডিম বোঝে তো কচু! আবার উস্‌কুচ্ছেও তো নোকে।

কে উস্‌কুচ্ছে মিতে?

ওই কেশব। ছোঁড়াডা শহর থেকে এসে যেন নাটসায়েব হয়েছে—কথায় কথায় ইন্‌জিরি! জামা গায়ে, জুতো পায়ে, ইয়া টেরি মাথায়! চলে না তো মা বসুমতীকে নাথি মেরে মেরে যায়!

কেশব চাকরি করছিল না কলকাতায়? আশু শুধোয়।

তারই গরম মিতে। বাপের তো সাতআট বিঘে ভুঁই—ছ'মাসের ভাত মেরে কেটে হয়—তারই ঠেলায় চোদ্দভুবন অন্ধকার!

কেশবকে বেশ মনে পড়ে। ছিদাম ঘোষের ছেলে—ইস্কুলে মাঝামাঝি ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল! বাপের অবস্থা ভাল ছিল না—ইস্কুল ছাড়িয়ে হাতে কাস্তে-লাঙ্গল তুলে দিলে। ছেলে কাস্তে টান মেরে ছুড়ে ফেলে বলল--এসব কাজ আমাকে দিয়ে হবে না—চাকরি করব।

বাপ রাগ করে বলল, তুই মরগা যা—যা তোর পেরান চায় করগা।

বাপের অন্ন ধ্বংস করতে লাগল কেশব। প্রায় পাঁচ ছ' বছর কাটল এমনি করে। সাবালক হল ছেলে। উমাকালীর মা—কেশবের মায়ের কাছে এসে কথাটা পাড়ল। কেশবের মা বলল স্বামীকে। কেশবের বাপ বিচার করে দেখল—এটা ভালই হবে। উমাকালী বাপমায়ের একমাত্র সন্তান। ওদের সামান্য যা জমিজমা আছে—জামাই হলে সে সবই অর্শাবে কেশবকে। সানন্দে কথাটা পাড়ল উমাকালীর বাবার কাছে।

শুনে উমাকালীর বাবার মুখ গম্ভীর হল। বলল, ভেবে দেখি।

বাড়ী এসে খুব কষে ধমক দিল বউকে। ওই অকম্মা ছেলেকে জামাই করবি? তোর ইচ্ছেকেও বলিহারি!

কেন—ছেলের পেটে যা বিদ্যে আছে—এ গেরামে কটা ছেলের তা আছে শুনি? ক্ষীণ প্রতিবাদ তুললে উমার মা।

রাখ তোর বিদ্যে—যে ছেলে উপার্জন করে না—তার দাম কি! আবার কষে একটা ধমক দিল উমাকালীর বাবা।

গল্পটা বলতে বলতে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠত উমাকালী। একবার নয়—বহুবার ওর মুখে কেশবের গল্প শুনেছে আশু।

তারপর একদিন কেশব-দাদা গেরাম ছাড়ল—চাকরি করতে গেল শহরে। তোমার সঙ্গে যেবার বিয়ে হয়—সেইবারেই শহর থেকে এসেছে নতুন। উঃ—কি জামাকাপড়ের বাহার! মাথায় টেরি, রুমাল, এসেনের গন্ধ—আবার সিগ্‌রেট খায় আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে।

হাঁ, আশুরও মনে আছে। দেখা করতে এসে ওর হাতটা টেনে নিয়ে সে কি ঝাঁকুনি! আশু তো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে কেশবের রোগা লিক্‌লিকে দেহটা যা দুলে দুলে উঠছিল! আর মুখে হ্যাট্ ম্যাট্ গ্যাট্ ইঞ্জিরি বুলি—যেন তপ্ত খোলায় চড়বড় করে খই ফুটছে!

সেই কেশব! সে আবার কিসের পরামর্শদাতা হল!

আশু বলল, তা কেশব তো ঠাকুরদেবতা মানত না।

এখন শুনছি মানে। শহর থেকে এসেছে হাড়ীর হাল হয়ে। একটা কাবুলীওলা একদিন এসে কি হম্বিতম্বী—কেশা তো বাড়ীমুখো হল না সেদিন! শহরে অনেক কীর্ত্তিকাণ্ড করেছে শুনছি। চাকরির ওকম্মো হয়ে গেছে। চোখ টিপে হাসতে লাগল মিতে।

তা এখন কি করছে? আশু জিজ্ঞাসা করল।

এখনও নাঙলে হাত দেয়নি—ফোপরদালালি করে বেড়াচ্ছে।

যাই বল মিতে—তোমার শ্বশুর থাকলেও বা কথা ছিল! শাউড়ি মেয়েছেলে তো—অষ্টপহর জপিয়ে জপিয়ে মাথায় না হাত বুলোয়! তুমি মদ্যিমিশেলে যেও—বুঝলে?

যাওয়ার ইচ্ছা হয়—রঘুনাথপুর টানে প্রবলবেগে—কিন্তু—বাধা ওই সেগুনবনটা—মোটা মোটা গুঁড়ির তর্জনী উঁচিয়ে শাসন করে আশুকে—খবরদার, আর এগিয়ো না।

নীলের আগের দিন রবিবার পড়ল। মিতে হাটে এলো না। তিনটি দিনের সন্ন্যাস—আজ থেকেই সুরু। একবার দেখে এলে হতো—কেমন আছে।

তারপর মহানীল—তার পরের দিন চড়ক। আশু—ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। কে জানে কেমন আছে উমাকালী!

পয়লা বৈশাখ—নতুনখাতা মহরতের নিমন্ত্রণ। বেশ কিছু রসগোল্লা আর বঁদে-মিঠাই পাওনা হ'ল। আশু ঠিক করল—আর দেরি করবে না—কাল বৃহস্পতিবারে হাটে মিতের কাছে খবর নিয়ে—বৈকালেই রঘুনাথপুর রওনা হবে।

সেদিনও নতুনহাটে মিতে এলো না—আশুর মন আর ধৈর্য মানল না—সকাল সকাল হাট থেকে ফিরে মাটির ছোট হাঁড়ীতে মিষ্টিগুলি ভর্তি করে একখানা ফরসা ন্যাকড়া দিয়ে সেটি ভাল করে বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিল। বলল, পিসি—রঘুনাথপুরে যাচ্ছি।

বেচাকালী খুশি হল। বলল, আয় বাবা—ভাল খবর নিয়ে আয়। দুগ্‌গা-দুগ্‌গা—

দালাল-পাড়ায় পুঁটিরামের সঙ্গে দেখা। সে একগাল হেসে বলল,—কোথায় গো স্যাঙ্যাৎ—? মথুরাপুরী নাকি?

হুঁ। হাসতে হাসতে পাশ কাটাল—আশু।

গ্রামে ঢুকল। একেই বসতি-বিরল গ্রাম, তাতে দুপুরবেলায় বউ-

ঝি—মানুষজনের কেউ গঙ্গায় নাইতে গেছে—কেউ বা ডোবার ধারে বসে ক্ষারে সিদ্ধ করা কাপড় আছড়াচ্ছে। উনুনে আগুনও দিয়েছে কেউ।

কঞ্চির আগড়টা ঠেলে গলা খাঁকারি দিয়ে উঠোনে পা দিল আশু। শাশুড়ী নেত্যকালী—গরুকে জাবনা মেখে দিচ্ছিল আর আপন মনে গজগজ করে কি বকছিল।

ওকে দেখেই—জাবনা মাখা হাতে ঘোমটা টেনে এক দৌড়ে দাওয়ার ওপর উঠে গেল। সেখান থেকে একেবারে ঘরের মধ্যে। থ হয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল আশু। উমাকালীর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না—শাশুড়ীও বেরুল না ঘর থেকে।

অবাক হবারই কথা।

খানিকক্ষণ পরে বোধ হল, ঘরের ভিতরে চাপা গুনগুনানি একটা কান্নার শব্দ। বাড়ীতে দু'জন মাত্র প্রাণী। উমাকালী কাঁদছে কি?

কাঁদছিল নেত্যকালী। মিনিট পাঁচেক যথাকর্তব্য সেরে দীর্ঘ ঘোমটা টেনে একখানা পিঁড়ি হাতে করে ঘরের বাইরে এলো। পিঁড়িটা দাওয়ায় পেতে দিয়ে বলল, বস বাবা—বস।

হতভম্ব আশু পিঁড়িতে বসতেই—নেত্যকালী ডুকরে কেঁদে উঠল, ওগো—আমি কেমন করে কালামুখ দেখাবো গো—আমার সোনার উমাকে কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে এলাম গো! ওগো—

আশু চীৎকার করে উঠল, কি—কি—কি হয়েছে?

সেই চীৎকারে তাল দিয়ে গলা ছেড়ে মড়াকান্না জুড়ে দিল নেত্যকালী।

উঠোনে ছেলেবুড়ো মিলিয়ে জনাকতক জমল। তার মধ্যে মিতেও ছিল। সেই ডাকল আশুকে, মিতে—শোন।

আশু ওর সঙ্গে বাড়ীর বাইরে এলো।

নিজের বাড়ীতে এনে যত্ন করে বসালে আশুকে। পা ধোবার

জন্য জলের গাড়ুটা এগিয়ে দিল—গামছা রাখল চালের বাতায় গুঁজে। বলল, হাতমুখ ধুয়ে জিরো—বলছি সব।

না, আগে বল। সজোরে ওর হাত চেপে ধরল আশু।

মিতে বলল, বলবার কতা কি আছে—বুড়ো মাগী জানে না কাঠ খেলে আংরা বার হয়? বলি কেশব কোন্ সুবাদে আসত বাড়ীতে? দিন নাই রাত নাই—হুট্ হুট্ করে আসত? তার সঙ্গে কত শলাপরামশ্য—ফুস্বুর-ফুস্বুর গুজুর-গুজুর! তারকেশ্বরে যাবে পূজো দিতে! তা গাঁয়ে এত নোক থাকতে ওনার সঙ্গে মেয়ে পাঠালি কোন্ আক্কেলে? মানলাম—আরও সন্ন্যিসি ছিল সঙ্গে—একটু থেমে বলল, আজ তিনদিন হল—কেশাও উধাও—তোর বউও।

সব ঢাকগুলো একসঙ্গে বেজে উঠল—আশু টলে পড়ছিল—মিতে সাপটে ধরল। বলল, ঝ্যাঁটা মার অমন নষ্টদুষ্টু মেয়ে-নোকের মুখে—তুই আবার বিয়ে করগা যা মিতে।

ঘুমের ঘোরে পথ চলে মানুষ—নিশির ডাকে কোন্ তেপান্তরের মাঠে বেঘোরে প্রাণ হারায়—এ হল বিপথে যাওয়ার গল্প—। অজ্ঞানে পথ ভুল না করে ঠিকানায় কেমন করে পৌঁছানো যায়—সেটা এইমাত্র বুঝল আশু। কাঁচা রাস্তার দু'ধারে বন ঝোপ—শেয়াকুল কাঁটা—সিজ-মনসার বেড়া—পগার গর্ত সে সব পেরিয়ে হরিপুরের বাজার শেষ হল। আবার দুধারের মাঠ চিরে আঁকাবাঁকা রাস্তা—সেই শক্ত বেড়া—সেগুন বন—তারপর ময়রাদের পড়ো গুড়ের কারখানা—গ্রামের শেষ সীমানা।

গ্রামের প্রান্তে একটা ভাঁটিখানা। সেখানে সন্ধ্যামুখো লোকের ভিড় কিছু জমেছে। দিনমজুরী শেষ করে বুনো তবলদারেরা কুড়ুল কাঁধে ফেলে—হরিপুরে আসবার মুখে এই ভাঁটিখানায় খানিক জিরিয়ে নেয়। দুএক পাত্র তাড়ি টেনে দেহে মনে স্ফূর্তি সঞ্চয় করে। ঘরে ফেরে সন্ধ্যা উৎরে গেলে।

আচ্ছন্নের মত এতটা পথ চলে এসেছে আশু—কোন অনুভূতিই জাগেনি। ভাঁটিখানার সামনে এসে প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করল। পচাই মদের গন্ধ দূর থেকে ভেসে আসছে—জড়িত কণ্ঠে কোলাহল তুলেছে পানোন্মত্ত মানুষগুলি। সারাদিনের পরিশ্রম, দারিদ্র্য, আগামী কালের দুর্ভাবনা কিছুই পীড়া জমাচ্ছে না মনে। সামান্যমাত্র পয়সার বিনিময়ে এক বিস্মৃতির চন্দ্রাতপ তৈরী করে তার তলায় আনন্দের হাট বসিয়েছে এরা।

পায়ে পায়ে ভাঁটিখানার দিকে এগিয়ে গেল আশু। খেজুরের চ্যাটাইয়ে গোল হয়ে বসেছে নানা জাতের দিনমজুরেরা—মাঝখানে সুধার কলস, প্রত্যেকের হাতে মাটির ভাঁড়। খাওয়া শেষ করে ভাঁড়টা ভাঁটিওয়ালার দিকে দিচ্ছে এগিয়ে—পূর্ণপাত্র ফিরে আসছে যথাস্থানে। আনন্দের ঢেউ উঠছে উথলে।

আশুর ফরসা জামাকাপড়—ভব্য বেশবাস দেখে খাতির করে নড়বড়ে টুলটা এগিয়ে দিলে ভাঁটিওয়ালা। খাতির করে বলল, বস্তাজ্ঞে হোক। তারপর হুকুম করুন, কি চাই? টাটকা তালের রস আছে আমানির সঙ্গে পাঞ্চ করে দেব। এক গ্লাস টেস করে দেখুন—ভাল না লাগে দাম দেবেন না।

গ্লাসটা হাতে নিয়ে সম্বিৎ ফিরে এলো আশুর। ইস্—একি বিষ হাতে তুলে ধরেছে আবার! আঘাত পেয়েছে বলে কি এতই দুর্বল হয়ে গেল! মহাদেবের মাথায় হাত রেখে দিব্য করেছিল না—জীবনে ও জিনিস ছোঁবে না? যেমন জীবনের দাম কানা-কড়ি হয়ে গেল, অমনি দেবতার কাছে কথা দেওয়ার দামও রইল না।

দোকানীকে জিজ্ঞাসা করল, কত দাম?

আগে মালটা পরখ করুন বাবু—তারপর—

কত দাম বল আগে? ধমক দিল আশু।

আজ্ঞে—আট আনা গেলাস।

আর গেলাসের দাম?

ওই তো বললাম—আট আনা।

উঁহু—এই কাঁচের গেলাসটার দাম কত? মানে মাল বাদ দিয়ে গেলাস।

দোকানী একটু ভেবে বলল, তা আট আনা হবে না কি? ভাল বিলিতী গেলাস—

একটা টাকা দোকানদারের হাতে দিয়ে আশু গ্লাসটি সজোরে আছাড় মারল একটা গাছের গুঁড়িতে।

হায়—হায়—হায়! এমন সেরা মালটা বেবাক ফেলে দিলি বাবু! বুনো তবলদারের দল চীৎকার করে উঠল।

আশু তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

॥ আটাশ ॥

বেচাকালী ক্ষুদিরামকে খবরটা দিলে। ওরে, বুড়ো বয়েসে এত খোয়ারও ছিল কপালে! বউ বাপের-বাড়ী যায় না কি কারো—তা বলে এমন সব্বত্যেয়াগী হয় মানুষ! ওরে ক্ষুদে, তুই একবার বুঝিয়ে বল বাবা। দিন-রাত গুম মেরে থাকলে মানুষ বাঁচে! হাটে বাজারে বসবে না—নামমাত্র ভাত ছোঁবে; হাসে না, কাঁদে না—শেষকালে কি পাগল হয়ে যাবে! এমন করলে পেট চলবে কেমন করে!

ক্ষুদিরাম বোঝাতে এলো। বললে, এমন করে থাকলে সংসার থাকবে?

চুলোয় যাক সংসার। খিঁচিয়ে উঠল আশু।

পেট চলবে?

না চলুক গে।

তুই হলি কি আশু! সবাইএর চেয়ে ভাল কামাই করছিলি—এমন করলে—

যার সংসার নেই—তার কিছু নেই। মনে হল নিঃশ্বাস চাপছে।

বউমা বাপের বাড়ী গেছে—আসবে যখন—

আসবে না। বলতে বলতে ওর চোখে প্রায় জল এসে গেল।

ধমকের সুরে বলল ক্ষুদিরাম, না—আসবে না! কাল থেকে বাজারে বসবি, বুঝলি?

বুকে একটা চাপড় মেরে আশু বলল, ক্ষুদেদা, বুক ভেঙ্গে দিয়ে গেছে! বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

ক্ষুদিরাম ওর পাশে বসে পড়ে পিঠে একখানা হাত রাখলে। কোন কথা বলল না। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল আশু। কান্নার বেগটা কমে আসতে ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করল, হাঁরে—বিত্তান্তটা কিরে?

বলছি। চোখ মুছে শক্ত হয়ে বসল আশু।

সমস্ত শুনে ক্ষুদিরাম বলল, নারে—কোথায় বেব্‌ভুল হয়েছে সন্দ হচ্ছে! নোকের মুখে অনেক রটে—কাগে কান নিয়ে গেল বলে নিজের কানে হাত দিয়ে দেখবি নে—কাগের পেছু পেছু ছুটবি?

খবর কি নেব—

কাল আমার সঙ্গে রঘুনাথপুরে চ—ভাল করে খোঁজ খবরডা নিয়ে আসি।

আমি যাব না, তুই যা।

পরের দিন ক্ষুদিরাম এসে বলল, যা ভেবেছি তাই। এর মধ্যে কোথায় একটা গোল রয়েছে! কেশা ছোঁড়াকে চেপে ধরলাম—ভয় দেখালাম—পুলিসে দেব বলে।

কেশব! সে এলো কোথা থেকে? অবাক হল আশু।

তুই যেদিন গিছলি—সেদিন রাত্তিরে ফিরেছে। যা বলছে বিশ্বাস হয় না। বলছে কি জানিস—আমি কিছু জানি নে। তোর

বউয়ের মান করে বলছে, ও পালাচ্ছিল আর একটা নোকের সঙ্গে, আমি ধারণ করলাম—তা সেই নোকটা তেড়ে এসে এমন মারলে —এই দেখনা হাতখানা মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। হাতখানায় দেখলাম ন্যাকড়া বাঁধা।

তবে ?

সন্দ তো ওইখেনে। সরকারের রাজত্বি—দিন তুপুরে এমন কাণ্ড ঘটে কখনও ! ওর সব বানানো কথা।

বানিয়ে বলে ওর লাভ ? অবিশ্বাসের হাসি হাসল আশু।

সেইডাই তো ভাবছি। তক্কে তক্কে আছি—বুঝলি, ওর পেটের কথা টেনে বার করবই করব।

পরের দিন ক্ষুদিরাম ওকে বাজারে টেনে নিয়ে গেল। কাঁচকলা আর ঝিঙ্গে ভর্তি ঝাকাটা ওর সামনে বসিয়ে দিয়ে বলল, বেচাকেনা কর—মন ভাল থাকবে।

খদ্দেরের সঙ্গে দরদস্তুর আর আনাজ ওজন করতে করতে মনের বোঝা অনেকখানি হাল্কা হল যেন। কিন্তু বাড়ীতে এসেই সেই গুরুভার চাপল মাথায়। এখানে উমাকালী প্রতিটি জিনিসে জড়িয়ে রয়েছে। শোলার দাঁড়শুদ্ধ ময়না পাখীটা চালের বাতায় ঝুলছে, তার পাশে লাল-সাদা-গোলাপী কাগজের ফুল। জলচৌকির উপরে পাট করা রয়েছে হাতী-ঘোড়া-ফুল-তোলা কাঁথাগুলো, লাল ঝুমঝুমি আর চুষিকাঠি তোলা রয়েছে কুলুঙ্গিতে। কালো পাড় শাড়ীখানা দড়ির আলনায় গোছানো, এখনই স্নান সেরে এসে পরবে উমাকালী।

পিতলের ছোট পানের ডাবরটা তেঁতুল দিয়ে মেজেঘষে চকচকে করেছিল ও। এ বাড়ীতে পান খাওয়ার পাট উঠে গিয়েছিল বহুকাল—উমাকালী ডাবর মেজে সুপুরি চুন খয়ের কিনে ব্যবস্থাটা চালু করেছিল।

এক একদিন পানের রঙে ঠোঁট রাঙিয়ে হেসে বলত, তোমার খুনখারাপি রং এর চেয়ে লাল হয় ?

সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত ছট্‌-ফট্‌ করে আশু। তন্দ্রা আসে ভোরবেলায়। ঘুম ভাঙে রোদ উঠবামাত্র—চিরদিনের অভ্যাস। গা মাটিমাটি করে।

সন্দ্যে থেকে যমযন্ত্রণা আরম্ভ হয় ক্ষুদেদা—কি যে করি!

ক্ষুদিরাম বলে, এক কাজ কর তা'লে। যাত্রার আড্ডায় গিয়ে বস গা। নতুন-বাজারে যাত্রার দল খুলেছে ওরা।

না—যাত্রা আর নয়।

তবে তাসের আড্ডায় চ। তবু দুদণ্ড অন্যমনস্ক থাকবি।

ও নরককুণ্ডু ক্ষুদেদা—

তুই তো আর মদ খাবিনে—গিয়ে বসতে দোষ কি! নিজে ঠিক থাকলে কোন্‌ মিঞাকে ভয়!

তুমি যাবে তো ?

সবদিন হবে না—সংসারে নানান ঝঞ্ঝাট। মাঝে মাঝে যাব।

আশুকে দেখে বলাই, পুঁটিরাম, বভিনাথ, গুপী, কালিপদ প্রভৃতি আনন্দে চীৎকার করে উঠলো, আরে, এসো এসো ইয়ার। আজ ডুমুরের ফুল দেখলাম রে—ডুমুরের ফুল দেখলাম!

পুঁটিরাম তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কোঁচার খুঁটটা মাথায় তুলে কোমরে দু'হাত ঠেকিয়ে গেয়ে উঠল ঃ

কালা—তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি,
চেয়ে চেয়ে গেল আমার কাজলপরা দুটো আঁখি।

হায়-হায়-হায়! আর সকলে সুর করে চেঁচিয়ে উঠল।

আজ কিন্তু ভাল খাঁটি চাই। গুপী বলল।

নিশ্চয় নিশ্চয়। সকলে সমর্থন করল।

তাসখেলা আরম্ভ হল—হাতে হাতে মদের গ্লাসও ফিরতে

লাগল। ছ'এক গ্লাস ফেরার পর একটি গ্লাস পূর্ণ করে পুঁটিরাম আশুর সামনে ধরে বলল, রেশো—তুই না খেলে আসর জমছে না মাইরি!

আমি খাব না। পুঁটিরামের হাতটা ঠেলে দিল আশু।

আমার মাথা খাস রেশো যদি না খাবি। পুঁটিরাম কাঁদ-কাঁদ গলায় সুর টানল।

বগুিনাথ বলল, তুই কি ওর ঘরের মাগ যে, তোর মাথা খাবার ভয়ে ও মদ খাবে!

পুঁটিরাম কান্নার সুরে বলল, ঘরের মাগ তো পরকে বিলিয়ে ফকির হয়েছিস রেশো। নে—ধর, তার জন্যে আর মন খারাপ করিসনে।

দপ্‌ করে জ্বলে উঠল আশু, মুখ সামলে কথা ক—শুয়ার কি বাচ্ছা।

পুঁটিরামও চড়ে উঠল, ইঃ—চোখ রাঙাস কাকে ভেড়ের ভেণ্ড! তোর মাগ যখন কালনার গঞ্জে দোকান খুলবে—

সামনেই ছিল মদের বোতলটা—টপ করে তুলে পুঁটিরামের মাথায় বসিয়ে দিল আশু।

ওরে খুন করলে রে—মেরে ফেললে রে—হৈ হৈ চীৎকার করে উঠল সবাই।

পুঁটিরাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল—ধুলোমাখা মাত্বর লাল হয়ে উঠল।

॥ উনত্রিশ ॥

আপোষে মিটল না ব্যাপারটা—কোর্ট পর্যন্ত গড়াল। বিচারে ছ'মাস কারাদণ্ড হল আশুর।

যাক ভালই হল—বাইরের জগৎ মুছে গেল এইভাবে। ছোট্ট এক ফালি জায়গায় রুটিনবাঁধা জীবন—একটু এদিক ওদিক হবার যো নেই। মন মেলে একটু যে চিন্তা করবে—সে সময় কম। কিন্তু চিন্তা যখন আসে—একশোটা মৌমাছি যেন হুল ফুটিয়ে দেয় মাথায়। এক একদিন রাত্রিতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না—ছোট্ট ঘরখানির অন্ধকারে জুলজুল করে চেয়ে থাকে। চারদিকের দেয়ালে অন্ধকার মাখা—মেঝেয় ছাদে অন্ধকারের পলস্তরা, ছোট দরজার ওপারেও হয়তো অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে—আদিঅন্তহীন মাঠের মতই—ধূ-ধূ করছে। কি থেকে কি হয়ে গেল। কার পাপে হল এমন? যৌবনবয়সে যা করেছে আশু—সে তো বেশীরভাগ লোকেই করে থাকে। ওই বদ্যিনাথ, গুপী, কালিপদ, পুঁটে, মন্তেজালি—এমন কি ক্ষুদিরাম পর্যন্ত নির্দ্দোষ নয়। কিন্তু ওদের বেলায় ভগবানের কোপ পড়ল না—কোপ পড়ল তারই উপরে! ওরা তো দিব্য বউছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে। সংসারে অভাব অনটন যা আছে—এমনভাবে কলঙ্কের কালিতে ঘরদোর লেপে দেয়নি তো কেউ। সবই কি অদৃষ্টের ফল! সেই যে যাত্রার দলে ছোটবেলায় জুড়িদের সঙ্গে গান ধরত—

অদৃষ্টের ফল—কে খণ্ডাবে বল,
তার সাক্ষী দেখ দময়ন্তী নল।

তার জীবনেও সেটা যে এমন মর্মান্তিক সত্য হবে, কে জানত!

এমনি করে ক'টা মাস গেল। শরৎ হেমন্তের প্রভেদ ধরা গেল না—শীতের দিনে শুধু বোঝা গেল—শীত এলো। আশুর দেহে শীতও দাঁত বসাতে পারল না। শুধু কাজ আর চিন্তা—তারই উত্তাপে চারটি মাস শেষ হল এখানে।

মাঘমাসে একটি নূতন লোক অন্য সেল থেকে এদের সেলে বদলি হয়ে এলো—হয়তো বা অন্য জেল থেকে। দিব্য কান্তিমান প্রৌঢ়—দাড়িগোঁফে ঢাকা প্রশান্ত নির্মল একখানি মুখ—কথা কইলে মনে সান্ত্বনা মেলে।

সে এসেই সকলকার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলে। আশুর পরিচয় নিতে এসে অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তুমি এখানে কেন? আশ্চর্য তো!

আশুরও চমক ভাঙ্গল ওর গলার স্বরে। ওর পানে চেয়ে ভাবল—একথা আমিও বলতে পারি তো—আপনি এখানে কেন? সে কথা না বলে—বলল, আপনি চেনেন আমায়?

লোকটি হাসল, চিনি—হাঁ, চিনি বইকি। তোমরা এখানে আসবে কেন—তাইতো ভাবছি! দেখি—তোমার হাত দেখি?

ভয়ে ভয়ে হাত মেলে ধরল আশু।

ভয় কি—আমি জ্যোতিষী নই। শুনে খারাপ কিছু বলব না। উল্টেপাল্‌টে হাত আর কররেখা দেখল—হাতের উপর হাতখানি আলগোছে নাড়িয়ে ওজন নিলে—চোখ মুখ বুক দেখলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নাঃ—তোমার এখানে আসা উচিত ছিল না। অপরাধের কোন চিহ্নই দেহে নেই।

আশু ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

লোকটি কোমল স্বরে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—ঠিক বলবে ভাই?

ওঁর মিষ্ট সম্বোধনে গলে গেল আশু। এ জগতে আসা পর্যন্ত

এমন দরদমাখা স্থুরে কেউ ডাকেনি তো। ওর চোখের কোল দু'টি আর্দ্র হয়ে উঠল।

উনি বললেন, বুঝেছি—ভারি দাগা পেয়েছ। তোমাদের মত মানুষরা দাগা পায়ই—শীগগির ভুলতে পারে না—তাই কষ্টভোগ করে। কি হয়েছিল ভাই ?

আমার পরিবার—, বলতে পারল না আশু—স্বররুদ্ধ হল।

কেমন অদ্ভুতভাবে হাসলেন উনি। বললেন, বুঝেছি—সব ক্ষেত্রে একই জ্বালা। উঁচুতলায়—নীচুতলায়—মাঝের তলায়। তা ভাই—জ্বালাটা তো চিরকাল থাকে না মনের মধ্যে—বিশেষ করে এই জোয়ান বয়সে। ওটা বা'র করে দেবার চেষ্টা করেছ কি ?

হাঁ করে চেয়ে রইল আশু।

তেমনিধারা হাসতে হাসতেই বললেন, বুঝতে পারলে না ? এতো খুব সোজা। তোমার আঙ্গুলটা প্রদীপের মুখে ধরলে পুড়ে যায়, ফোস্কা পড়ে, জ্বালা করে। সেই জ্বালা চিরজীবন থাকে না। তেমনি মনেও যা জ্বালা ধরায়—সময় তা আরাম করে দেয়। আজ তুমি আমি এক হয়েছি—দু'জনের সুখ-দুঃখের ভাগ নিচ্ছি—কাল খালাস পেয়ে আবার চলে যাব কে কোথায়—কেউ কাউকে জীবনে দেখব না হয়তো। সংসারও তেমনি—যতদিন একসঙ্গে আছ মমতার একটি বাঁধন পড়েছে। সে বাঁধনে স্নেহ-ভালবাসার গিঁট পড়ে পড়ে শক্ত হচ্ছে ক্রমশঃ। আবার খুলেও যাচ্ছে বাঁধন—তখন হাহাকার—বুক চাপড়ানো। কিন্তু ভাই, কাছেই আসুক আর দূরেই যাক—কাউকে 'না' বলার সাধ্য কই আমাদের! যা আসবে নিতেই হবে হাসিমুখে। হাসিমুখে না নাও—চোখের জল ফেল। একই কথা। চারদিকে কত হাসির ঢেউ—কত চোখের জলের স্রোত—তারই মধ্যে পা ফেলে ফেলে চলছি আমরা। পা ফেলে চলতেই হবে যে—দাঁড়ালে ধাক্কা খাবো, মুখ থুবড়ে পড়বো, উঠতে পারবো না।

কি লেকচার দিচ্ছ অবনীশদা? ও—ভাল শ্রোতা পেয়েছ দেখছি!—আর একটি যুবক কাছে এসে দাঁড়ালো।

না রতীন—ভাবছি এরা, এই নির্দোষ মানুষগুলি, এখানে কেন আসে! আমাদের বিচারটা আইনের অনেক ডালপালা সাজিয়ে পাল্লার একদিকে চাপিয়ে দেওয়া শুধু—অন্যদিকে থাকে একটি-মাত্র মানুষ—তার ভিতরের খবরটা আইনের আঁকশী দিয়ে বার করার নিয়ম নেই, শক্তি নেই। থাকলে দেখতে—ডালপালার চেয়ে সেইদিকটা কতখানি ঝুঁকে পড়েছে। অবনীশ গম্ভীর স্বরে বললেন।

রতীন বলল, তোমার হেঁয়ালি ছাড়—তোমার কি বিশ্বাস এই লোকটা নির্দোষ?

নিশ্চয়। দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর অবনীশের কণ্ঠে।

মনের উত্তেজনায় ও হয়তো এমন একটা কাজ করেছে—

সেটাই সম্ভব। কিন্তু সে ওর জীবনে কতটুকু দাগ! মুছে ফেলা কঠিন ছিল না। অবনীশ বললেন।

রতীন বলল, তোমার জীবনেও তো এমনি একটা ভুল—

সে ভুল শোধরাবার চেষ্টা করছে আইন আমাকে সাজা দিয়ে। কিন্তু আমি যদি শাস্তির ভয় না করি—কেউ পারবে বোঝাতে? হাসলেন অবনীশ।

তুমি না বুঝতে পার—অপরে সাবধান হবে।

দৃঢকণ্ঠে বললেন অবনীশ, হবে না। যে ভুল উত্তেজনার মুহূর্তে ঘটে—তা চরম শাস্তির ভয়েও আটকানো যায় না। সে ভুল শুধু শোধরানো যায়—তেমনই একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে উত্তেজনা না ঘটে। উত্তেজনার পর অনুতাপ আসে—সেই কি যথেষ্ট নয় ভুল শোধরাবার পক্ষে?

রতীন বলল, তুমি যা বলছ—তাতে জেলখানা উঠিয়ে দিতে হয়। ওতে দুর্নীতি বেড়ে যাবে বলে সবাই ভয় করছেন।

অবনীশ বললেন, সেটা নিছক ভয় আর সন্দেহ ; কি যে ঘটবে তাঁরাও জানেন না। তবে এটা আমরা মনেপ্রাণে জানি—বিশ্বাস করিও, মানুষের অভাববোধ থেকে নানা ধরণের দুর্নীতির জন্ম। সেগুলিকে দূর করতে পারলে অপরাধীর সংখ্যা কমে যাবেই।

ওরা কথা বলতে বলতে চলে গেল। আশু এ সব আলোচনা কিছুই বুঝল না। শুধু বুঝল—জ্বালাটা চিরকাল থাকে না। আগুন ইন্ধন না পেলে জ্বলে না—। এ জ্বালার ইন্ধন হল চিন্তা—অতীতের ভাবনা। আরও বুঝল—মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে—এগিয়েই যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে—গাড়ী পাল্‌কীতে চেপে যেমন করে হোক এগিয়েই যাচ্ছে। পিছনে যা জমছে তার সবগুলিকে সঙ্গে নেওয়ার উপায় নেই। অনেক ফেলে যেতে হচ্ছে। ছেড়ে দিতে হচ্ছে। হায় হায় করেও এগুতে হচ্ছে।

অবনীশকে একদিন নিজের দুঃখের কথা খুলে বলল।

অবনীশ বললেন, নিজের দুঃখের কথাই শোনালে ভাই—আর একজনের দুঃখের কথা তো বললে না ?

কে আর একজন ! অবাককণ্ঠে আশু শুধোলো।

অবনীশ বললেন, তোমার স্ত্রী। সে যে কতখানি সয়েছে—তা জানতে চেয়েছ কি ভাই ?

নূতন কথা। আশু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অবনীশ বলতে লাগলেন, সংসারটা তোমাদের দু'জনের—দু'জনেই মনে মনে অনেক সাধ করে তৈরী করেছিলে। তুমি করছিলে উপার্জ্জন—সংসার সচ্ছল হবে, তোমার বউ সাজাচ্ছিল ঘর—সেখানে আনন্দের হাট বসাবে। ছেলেমেয়েরা আসবে—তার মনে কত সাধ-আহ্লাদ ভাবতো ভাই। সেই সাধে ছাই পড়ল যখন—তার মনের অবস্থাটা ভেবেছিলে কি ? কেন সে পালিয়ে গেল তোমার কাছ থেকে—মন দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছিলে কি ?

আশু ছ'হাতে মুখ ঢেকে বলল, বুঝিছি বাবু, সে চেয়েছিল একটা ছেলে—

শুধু ছেলে নয়—তার জীবনের সবকিছু ছিল যে ওরই মধ্যে—সেই আঘাত সে সইতে পারেনি—

আমি ভুল বুঝিছি বাবু। আকুলকণ্ঠে বলল আশু।

স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন অবনীশ, তুমি ভুল বুঝেছ—আমিও ভুল বুঝেছি—যে কেউ ভুল বুঝতো। কারণ ভুল বোঝার মত মনই যে আমাদের। আমরা প্রভুত্ব করে করে এমনই মত্ত যে—বুঝতে পারি না—মন বস্তুটি আমার একার নয়। আমার পা পিছলালে যদি সামলে নেওয়া সম্ভব, অন্যের পা পিছলালে কেন তেমন মারাত্মক বলে ধিক্কার দেব! পুরুষ হোক—মেয়ে হোক—ছ'পক্ষকে সমান চোখে দেখাটাই আসল দেখা—বুঝলে ভাই?

আমি বুঝতে পারছি না আপনার কথা—তবে বুঝছি দোষ-ঘাট হয়েছে। কিন্তু কি করব আমি! আশু অস্থির হয়ে উঠলো।

নিজের দোষ যেমন শুধরে নিয়েছ—অন্যকে তেমনি সুযোগ দিও দোষ শুধরাবার। বললেন অবনীশ।

কিন্তু সে কোথায় জানি না বাবু! আশুর কণ্ঠে হতাশার সুর।

জানবার চেষ্টাও কর নি! তার ওপর রাগ করে পৃথিবীটাকে আঁচড়ে কামড়ে নষ্ট করতে চেয়েছ—একি ভাল? নিজেকে সামলাতে শেখ আশু—শান্তি পাবে।

আপনি কেমন করে জানলেন—

অবনীশের মুখে ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠলো। ওঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন ক্লান্ত ও করুণ শোনালো, জানি আশু। মানুষ যখন রেগে একটি কাণ্ড করে বসে,—সেটা তার একদণ্ডের উত্তেজনার ফল নয়—তার তলায় অনেক আগেকার চাপা ছঃখ অভিমান হতাশা থাকে মিশিয়ে।

একটু থেমে বললেন অবনীশ, তুমি ঈশ্বর মান আশু?

মানি! আশু ঘাড় নাড়লো।

ঠিক মনে মনে বিশ্বাস কর তিনি আছেন? ঈশ্বরের কোন্ মূর্তিটা তোমার ভাল লাগে? প্রশ্ন করলেন অবনীশ!

একটু চুপ করে থেকে আশু বলল, আজ্ঞে মহাদেবের।

মহাদেব নীলকণ্ঠ কেন জান? আবার প্রশ্ন।

আজ্ঞে জানি।

খুশিভরা কণ্ঠে বললেন অবনীশ, বেশ, বেশ। পৃথিবীতে নীলকণ্ঠ হতে না পারলে মানুষকে সত্যিকারের ভালবাসা যায় না। যার উপরে রাগ জমছে—যাকে নিয়ে দুঃখ-ব্যথা—যে আঘাত দিচ্ছে, তাকে ক্ষমা করাটা খুব কঠিন নয়। পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষ সে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ক্ষমা করলেই দেখবে ভালবাসা জন্মাল। তখন সব বিষ কণ্ঠে থুয়ে—সব অমৃত উজাড করে দিতে বাধবে না আশু। তখন শান্তি পাবে

এতকথা আপনি কি করে জানলেন বাবু?

জানি। অবনীশ হাসলেন। তোমার মত দুঃখ পেয়েছি আমিও। উপরতলার দুঃখ। সেই দুঃখ জয় করার চেষ্টা করছি ভাই। জয় করবই—না হলে যে হেরে যাব—দুয়ো দেবে সবাই। মানুষ দাগা দিয়ে গেলেই ঘা দগদগে হয় না—আমাদের মান-মর্যাদার কাঠি দিয়ে সেটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সাংঘাতিক করে তুলি আমরাই।

একটি নিশ্বাস ফেলে বলল আশু, বাবু—যা বলছেন—বুঝলাম। কিন্তু যে বউ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে—তাকে ফিরিয়ে আনা—'

ওই মান-মর্যাদায় বাধে, নয়? কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসা থাকলে মান-মর্যাদা কতটুকু! আচ্ছা আশু—তোমাদের গাঁয়ে কি এমন মানুষ নেই—যারা সমাজের বাইরে এসেও শান্তিতে বাস করছে?

আশু একটু ভেবে বলল, আছে বাবু--তাদের কেউ কাজে-কম্মে নেমন্তন্ন করে না। মহেন্দর ঘোষ—আর নন্দী বেনেনী।

তারা অসুখী কি? পুনরায় প্রশ্ন করলেন অবনীশ।

না বাবু—বেশ হাসিখুশি মুখ—মনে হয় সুখেই আছে।

উজ্জ্বলমুখে বললেন অবনীশ, তবে? ওরা ভালবাসে দুজনকে —তাই কে তাদের কি বলল গ্রাহ্য করে না। শিবকে যদি ভাল লাগে তোমার—তিনি যা করেছেন তাই কর। বিষ কণ্ঠে রেখে—মানুষকে ভালবাসতে শেখ, সুখ শান্তি দাও।

আশু মনে মনে বলল, সত্যি—বিষ আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়েছে —তাই কারও কথা সহ্যি হয় না। পুঁটেকে অমন করে মারলাম কেন? বউ দাগা দিয়ে গেছে—সেই জ্বালার ঝাল ঝাড়লাম ওর ওপর। সেদিন পিসিকে কষ্ট দিলাম—ভাতের থালাটা আছড়ে ফেলে—কি না অমন রান্না মুখে তোলা যায় না! সবাইএর উপর রাগ বাড়ছে—তাই বিষের মত লাগছে সংসার। না— এই বিষ হজম করতে হবে—না হলে নিজেও মরব—সবাইকে মারব।

খালাস পাবার দিন অবনীশের পায়ে প্রণাম করে বলল, বাবু যা শিক্ষে দিলেন—যেন বজায় রাখতে পারি। বউকে খুঁজে বার করব আমি।

তাই কর ভাই—শান্তি পাও। আশ্বাস দিলেন অবনীশ।

আশু মাথা তুলে বলল। সে যদি আমার সঙ্গে আসতে না চায়?

সে হিসেব-নিকেশ তার। তুমি অশান্তি পুষে রেখো না ভাই।

শেষ সংশয়টুকুও ওঁর ওই প্রশান্ত স্বরে যেন ঘুচে গেল।

আবার অবনীশের পায়ের কাছে হেঁট হল আশু।

॥ ত্রিশ ॥

বাইরের জগৎটা অনেক বড়, কঠিনও। মানুষগুলিও কম নির্দয় নয়। আশু প্রথম আঘাত খেলে সমব্যবসায়ীদের কাছে।

গ্রামে পৌঁছে প্রথম দেখা বদ্যিনাথের সঙ্গে। এক ঝাঁকা কাঁচকলা নিয়ে ও তখন বাজারে চলেছে। আশু এসে ওর সামনে দাঁড়াল। অন্তরঙ্গতার সুর মিশিয়ে ডাকলে, কিরে বদে, ভাল আছিস ?

যেন প্রত্যহ দেখা হচ্ছে এমনিভাবে একবারমাত্র চেয়ে দেখল বদ্যিনাথ। নিস্পৃহকণ্ঠে বলল, ভাল। বলে হন হন করে এগিয়ে গেল। ছ'মাস পরে দেখা হল যার সঙ্গে—তার সম্বন্ধে এতটুকু কৌতূহল ওর মনে নেই !

আঘাত লাগলো বইকি বুকে। সেটাকে—মন থেকে বা'র করে দিতে দিতে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে গুপীনাথের সঙ্গে দেখা। গুপী একটা সাঁওতাল মেয়ের বেগুনের ঝাঁকা ধরে টানাটানি করছিল। আশুকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আশু ওর তাচ্ছিল্য গায়ে না মেখে বলল, ভাল আছিস তো ?

গুপী বলল, কারও ধার করে খাইনি—কাউকে খুন-জখমও করিনি—ভাল থাকব না কেন।

আশু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আজ ছাড়া পেলাম।

সে তো চম্মচক্ষে দেখতেই পাচ্ছি। মুখ বাঁকিয়ে বলল গুপী।

সাঁওতাল মেয়েটি ইতিমধ্যে ঝাঁকা নিয়ে খানিকটা এগিয়েছে —গুপী তার পিছু পিছু ছুটল, আরে সরদারনি শোন, শোন। না হয় দু'আনা বেশীই নিবি—

পথে আর কারও সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল না আশু। সদর রাস্তা ছেড়ে গলিপথে বাড়ী পৌঁছল। ভাবল, দেশের লোক

কি ওকে খুনে বলেই ধরে নিয়েছে—জেলখাটা মানুষকে সবাই বুঝি ঘৃণার চোখে দেখে!

বেচাকালী উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে আপনমনে বকছিল। সদর দরজা ঠেলার শব্দে সচকিত হয়ে হাঁকল, কে র‍্যা? হুট্ হুট্ করে দুয়োর ঠেলে আসচেই! নস্কার চারাগুনো আবাগীদের গরু ছাগলের গব্বেই গেল!

আমি পিসি।

কে? বেচাকালী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। রেশো! ওমা, ইকি হাড়ির হাল হয়েছে রে তোর! ওরে আমি কোথায় যাব রে—, দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে কান্নার উদ্যোগ করতেই আশু বাধা দিয়ে বলল, পরে কাঁদিস পিসি—ঘরে কিছু থাকে তো দে—খিদেয় নাড়ী চুঁই-চুঁই করছে।

আহা—বাছারে আমার! তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের মধ্যে গেল বেচাকালী! ঘরের মধ্যে থেকেই বলল, কোথায় কি পাব—তেবাষ্টে চালভাজা আছে চাট্টি তাই একটু গুড় দিয়ে দেই। আমার যেমন পোড়া-কপাল—একটা অসগোল্লাও এনে রাখিনি ঘরে।

রসগোল্লা কি হবে—চালভাজা গুড়ই বেশ লাগবে। তোর হাতের চালভাজা কতদিন যে খাইনি পিসি।

বেচাকালীর খেদোক্তি চলল, আহা বাছা রে! আর কি নজরের যুত আছে রে—খোলা নামাতে দেরি হয়, চালভাজা পুড়ে যায়—চিবুতে পারি নে রে আশু। কোন রকমে পাক্‌লে পাক্‌লে খাওয়া!

পরিতৃপ্তি করে চালভাজা চিবোতে চিবোতে আশু বলল, কি র‍াঁধছিস পিসি?

কোথায় কি পাব বল—সজনের শাগ পেড়ে দিল ওদের হাব্‌লা ছোঁড়া—তাই, আর পাকা আমড়ার টক। আমার যেমন পোড়া-কপাল—! খেদোক্তি চললই।

আমি বাজার করে আনছি পিসি।

আহা, একটু বস—জিরো—

আসচি পিসি। আশু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

বাজারে যাবার জন্য বাজরা সাজাচ্ছিল ক্ষুদিরাম—আশু এসে দাঁড়াল। ক্ষুদে-দা—

কে—রাশু? কখন এলি? ক্ষুদিরামের স্বরে আনন্দের স্পর্শ।

খুশি হল আশু। বলল, এই মাত্তর। কি কি তরকারি নিয়েছ দেখি? আলু আর বেগুন এক পোয়া করে দাও দিকি আমায়।

দিচ্ছি—বোস। ঘরের দিকে মুখ করে হাঁকল ক্ষুদিরাম, ওগো শুনছো,—আমাদের রাশু এয়েছে। জলখাবার দেবা না ওকে!

আশু হাসল। বলল, ক্ষুদেদা, আমার সঙ্গে বড় যে কথা কইছ—ঘেন্না করছে না?

ক্ষুদিরাম বুঝল কোথায় ওর ব্যথা। বলল, ওদের সঙ্গে দেখা হ'ল বুঝি?

হাসবার চেষ্টা করে আশু বলল, হল বই কি—জেলখাটা মানুষের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক বল!

পেরথম পেরথম –এ হয় রে রাশু—একটা আকচও তো রয়েছে, পরে অবিশ্যি এ থাকবে না। এখন বাজারে বসতে গেলেও ছুট-বেছুট শুনতে হবে। সামলে-সুমলে চলতে হবে। আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করল ক্ষুদিরাম।

না-না—রাগ আমি মোটেই করিনি ক্ষুদেদা। দুঃখু অবিশ্যি হয়, তা সেও এমন কিছু নয়। মনে করছি, জলটল খেয়ে পুঁটিরামের কাছে যাব।

ক্ষুদিরাম যেন আঁতকে উঠল এই কথায়। তাড়াতাড়ি বলল, না-না—এখন নয়। ওনারা ভারি রেগে আছে রে।

রাগলেই বা—আমি তো রাগব না। শান্ত গলায় বলল আশু।

যা তা বললে সহ্যি হবে? অবাককণ্ঠে শুধোল ক্ষুদিরাম।

হবে।

যদি মারে? অধিকতর বিস্ময় ক্ষুদিরামের কণ্ঠে।

মারুক না। যদি মনে করে দু'ঘা মেরে শোধ হয়ে যাবে—বেশ তো। আশু হাসল।

তবু ক্ষুদিরাম আশ্বস্ত হল না। বলল, এবেলা থাক—ওদের হালচাল বুঝি আগে—তারপর—

ক্ষুদিরামের বউ ইতিমধ্যে একবাটি মুড়ি আর গোটাকয়েক ফুলুরি ও গজা এনে নামিয়ে দিয়েছে সামনে।

নে—খা।

এ সব এলো কোথা থেকে?

পান্তা ভাতের সঙ্গে ফুরুলি বেশ লাগে—রোজ আনে ছেলেরা। ওনাদের আবার মিষ্টি না হলে চলে না—তাই এক পয়সায় আট খানা আঙুলে-গজাও আসে।

সারা দুপুরটা আরাম করে ঘুম দিল আশু।

বৈকালে ক্ষুদিরাম এসে বলল, শোন—বাজারে বসা হবে না তোর। তুই বরঞ্চ উপার্জ্জনের অন্য চেষ্টা দেখ।

কেনে, বাজারে কি হল?

ওরা সব একজোট হয়েছে—তোকে মারবে—তোর বাজরা লুট করবে।

একি মগের মুলুক নাকি? পুরাতন দিনের আশু গর্জন করে উঠল।

ক্ষুদিরাম বলল, একজোট হলে সবই হয়। তুই তার চেয়ে গড়ের বাজারে বসগা—বেচা-ঠাকুর ঘুন্‌সি মাদুলির দোকানটা তুলে দিচ্ছে—ওই ঘরখানা নে বরঞ্চ।

ওখানেও লুট করে যদি?

না—, তুই তো আর ওনাদের অন্নে ভাগ বসাতে যাচ্ছিস নে

বাজারে। তেড়েমেরে আসে যদি—পাঁচজন ভদ্দর নোক আছে—মিটমাট হয়ে যাবেখন।

আশু বলল, ঝগড়া আমি করতে চাইনে ক্ষুদেদা। বাজারেও বসব না আমি। তবে পুঁটের কাছে দুষি হয়ে আছি, মাপ চাইব।

ওরা যদি বাগে পেয়ে মারে তোকে?

মারুক—মার খেয়ে মনে করব—আমার প্রাচিত্তির হল।

ওর গলার স্বরে নির্ভয়তার সুর। ক্ষুদিরাম অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে না।

মারলে না পুঁটিরাম—অনেক কড়া কড়া কথা বলল। পুঁটিরামের বউ—যা মুখে এলো—তাই বলল। রাগ করল না আশু। বলল, তোরা ঠিকই বলেছিস পুঁটে—আমি পাজী বদমায়েস—তবু তুই যদি মাপ না করিস—

যা যা—আর গরু মেরে জুতো দান করতে হবে না! পুঁটিরাম দাঁড়াল না সেখানে।

কি বেহায়া নিলজ্জে মানুষ গো! বউ মুখে নাথি মেরে চলে গেছে—তবু মুখ দেখায় কেমন করে গো! দড়িও জোটে না গলায়! পুঁটের বউ খরখর করে উঠল।

বাজারের প্রায় সব ফড়েই বর্জন করল আশুকে—কিন্তু ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিষাক্ত তীর ছুড়তে কসুর করল না।

আশুকে দেখলেই বন্থিনাথ হয়তো গুপেকে শুধোয়, কাল নাকি তোদের খুব মাইফেল চলেছিল রে?

বন্থিনাথ চোখ মটকে হাসে। বলে, চলবে না কেনে—আমাদের রেশোর বউটা যে নতুন দোকান খুলেছে—কালনার চকে।

কণ্ঠের বিষ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে—দোকানের খুঁটিটা ধরে কোনরকমে সামলে নেয় আশু। না—সহ্য করতেই হবে।

এ তার প্রাপ্য ফল। দুঃখ যেই দিক—আঘাত যেই হানুক—ক্ষমা করতে হবে। কণ্ঠের বিষ কণ্ঠে না রাখলেই তো জ্বালা।

আশুর সহ্যগুণ দেখে ওরা অবাক হল। আঘাত করলে যদি শব্দ না ওঠে—আঘাত করার উৎসাহ আপনিই কমে যায়। ক্রমে ওরা ক্ষান্ত হল। ওরা অনুভব করল—আশুর মধ্যে আরও একটি শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি ওদের থেকে উঁচু করে তুলে ধরেছে আশুকে।···ওরা যে মাটিতে পা দিয়ে চলছে—আশুর পায়ের তলায় সে মাটি নেই। আশুকে সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলতে লাগল ওরা।

আবার একদিন পুঁটিরামকে ধরল আশু। বলল, পুঁটেদা, মাপ করবে কিনা বল—না হলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব আমি।

অনবরত আঘাত করে করে এদের অস্ত্রও ভোঁতা হয়েছে। তা ছাড়া কালও মনোমালিন্যের তীব্রতাটুকু ঘুচিয়ে দিয়েছে। পুঁটিরাম বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, তোমাদের উঁচু মন—আমরা কি মাপ করবার যুগ্যি মানুষ!

আশু কাতরস্বরে বলল, আমি তোমাদেরই মত মানুষ—তোমাদের সঙ্গে থাকব পুঁটেদা। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতখানা চেপে ধরল। পুঁটিরাম দেখল—আশুর চোখে জল। আশু কাঁদছে। পুঁটিরাম কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, বাজারে বসবি কাল থেকে?

না। মাথা নাড়ল আশু।

তবে—! অবাক হয়ে চেয়ে রইল পুঁটিরাম।

তোমাদের অন্নে ভাগ বসাব না পুঁটেদা। বল তোমরা রাগ করবে না? ক্ষমা করবে? হেঁট হয়ে পুঁটিরামের পা ধরতে গেল আশু।

আরে—আরে করিস কি! পাগল দেখ। পুঁটিরাম অভিভূত

হয়ে ওকে বুকে চেপে ধরল। অভিভূত ভাবটা কাটিলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল পুঁটিরাম, ইস্—বাজারে বসতে দেবে না!. কার সাধ্যি দেখি তোকে বাজার থেকে হটায়!. আমি রইলাম তোর দিকে রাশু—দেখব ওনাদের কত ক্ষমতা! জিনিস তো তুই মিনিমাগনায় কিনিস নে—তবে ওনাদের গায়ের ঝাল কেনে অত! ওনারা খদ্দের বাগাতে পারে না—তা তোর কি দোষ!

পুঁটিরামের আস্ফালন চলতে লাগল।

এক সময়ে ওর কবলমুক্ত হয়ে আশু বলল, কাল বৈকেলে তোমার সঙ্গে কালনায় যাব পুঁটেদা।

বৈকেলে যাবি! পুঁটিরাম যেন চিন্তিত হ'ল। আমাদের কি জানিস—সবদিন হয়তো ফিরতে পারলাম না—জানিসই তো, অব্যেসটা ভারি খারাপ করে ফেলেছি—, লজ্জিতভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আমিও থাকব না হয়। আমার তো পিছনটান নেই পুঁটেদা।

চমকে উঠল পুঁটিরাম। তাড়াতাড়ি বলল, না—না সেখানকার কাণ্ডকারখানা জানিস তো! তুই বরঞ্চ কাল সকালে যাস আশু।

আশু কিন্তু বিকেলেই এল কালনায়। একলাই এলো। আকাশে মেঘের লেশমাত্র ছিল না—জিনিস কেনায় ওর ত্বরা দেখা গেল না। আলুর আড়তে দেখা হ'ল বিমলের সঙ্গে। একই গ্রামের লোক—কালনায় কাপড়ের দোকানে কাজ করে, ন'মাসে ছ'মাসে বাড়ী যায়। দেশে মা-বউ-ছেলে-মেয়েভরা পুরো সংসার—তবু এখানেও ছোটমত সংসার পেতেছে। সেইখানেই আহার আর আশ্রয়। আশুর সঙ্গে আলাপ সেই পুরাতন দিনে। ও যখন ডালিমের মোহে পড়ে কালনার হাটে ফড়েটিগিরি আরম্ভ করেছে—তখন থেকেই আলাপ।

বিমল বলল, কি আশুদা—অনেকদিন পরে দেখছি যেন?

হ্যাঁ, রাত্তিরটা থাকব মনে করছি। ওদিকে জায়গা-টায়গা আছে? আশু জিজ্ঞাসা করল।

বিমল হাসল, অঢেল জায়গা। যাবা নাকি? তোমার পুরনো ঘরেই থাকার বন্দোবস্ত করে দেবখন। ডালিম যে কোটা-ঘর থেকে আবার চালাঘরে এসেছে।

তবে যে শুনেছিলাম নতুন বাড়ী হয়েছে! ঈষৎ বিস্মিত হল আশু।

হবে-হবে হয়েছিল দাদা—তা বরাত! কথায় বলে—

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।

কপালে সইল না বেচারীর। বলে হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল।

আশুর মনটায় ব্যথা বাজল যেন। বলল, না ভাই, পুরনো জায়গায় যাব না। কোন নতুন জায়গায় নিয়ে যেতে পার যদি—

অভাব কি! এ গঞ্জে জোয়ারভাটা নেগেই আছে দাদা—আউতি যাউতির বাজার তো! এসো—ভাল এক জায়গায় নিয়ে যাব তোমায়।

আশুর বুকটা ধ্বক্ করে উঠলো। নতুন জায়গায় কার সঙ্গে পরিচয় ঘটবে—কে জানে!

নূতন জায়গা—নূতন মুখ। মেয়েটিকে দেখে আশ্বস্ত হল আশু। খুশি হল। বলল, শোন—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। তোমার পাওনাগণ্ডা দিয়ে দিচ্ছি—আলাদা একখানা ঘর চাই ঘুমোবার জন্যে।

আলাদা ঘর! মেয়েটির চোখ ছলছল করে উঠল। আলাদা ঘর কোথায় পাব বাবু? এই একখানাই ঘর—দিন আট আনা ভাড়া গুনতে হয়।

বেশ, তালে তুমি ঘরে খিল দিয়ে শুয়ো—আমি দাওয়াতে

ওই তক্তাপোষটায় বরঞ্চ জায়গা করে নেব। ভয় নেই—তোমার পাওনাগণ্ডা ফাঁকি দেব না। আশু ওকে আশ্বাস দিল।

মেয়েটি অনেকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল আশুর পানে। এমন অনিয়মের মানুষ তার জীবনে এই প্রথম এলো। এ মানুষ টাকা দেবে—অথচ···অবাককণ্ঠে বলল অবশেষে, রাত্তিরে কিছু খাবেন না বাবু? দোকান থেকে খাবার আনিয়ে দেই।

না, খেয়েই এসেছি আমি।

মেয়েটি আরও খানিকক্ষণ বোকা-বোকা চোখে চেয়ে রইল। এমন মানুষও ভূভারতে জন্মায়! একবার মনে হল—ঠাট্টা করছে না তো! না—ঠাট্টার চোখমুখের ধরণই আলাদা। ওর কপালে কঠিন তিনটি শিরা ত্রিশূলের আকারে ফুটে উঠেছে—দেখলে মনে হয়—ত্রিশূলের লোহার মতই শক্ত ওর মন—সেইমতই সূচ্যগ্র।

যাও, শোও গে—এই নাও টাকা। দুয়োরে খিল দিয়ে শুয়ো।

তক্তাপোষের উপর টাকা রেখে আশু শয়নের আয়োজন করল।

একটা নেপ দেই—বাইরে শীত করবে। মেয়েটি দরদ মিশিয়ে বলল।

আলোয়ানই যথেষ্ট। যাও! আশু শুয়ে পড়ল।

ভয়ে ভয়ে দুয়োর বন্ধ করল মেয়েটি।

॥ একত্রিশ ॥

ক্রমে কথাটা ও মহলে চাউর হয়ে গেল। অদ্ভুত একটি মানুষ এ পাড়াতে মাঝে মাঝে আসে। সে খাবার খায় না, মদ খায় না, বেলেল্লাগিরি করে না, মেয়েদের উপরও ঝোঁক নেই তার। নূতন নূতন ঘরে তার আনাগোনা। শুধু রাতের আস্তানা খুঁজে ফেরে ঘুমোবার জন্য।

পুঁটিরাম একদিন ধরল চেপে। বলতেই হবে এমন করে বাউণ্ডুলের মত খারাপ পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? জান ওতে বদনাম হয়?

আশু হেসে বলল, বদনাম তোমার বুঝি হয় না পুঁটেদা?

আমরা হলাম গিয়ে নামকাটা সেপাই।

আমিই বা কম কি। ডালিমকে জিজ্ঞেস করো। আশু হাসল।

তাহলে বলি। কাছে সরে ফিস্ ফিস্ করে বলল পুঁটিরাম, ডালিমই সেদিন বলছিল, আহা, ওনাকে যত্নআত্তি করার লোক নেই বুঝি? তুমি ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আমার কাছে এনো। হাজার হোক পুরনো মানুষ। একটা বেড়াল কি কুকুর পুষলে মায়া হয়, ওতো কতদিনের জানা-চেনা মানুষ।

আশুর মুখে একটু মলিন হাসি ফুটল। বলল, বললে না কেন—লোকটা বেড়াল কুকুরের অধম! থাকগে, কালনার বাজারে না হয় আর আসবই না।

আমি কি তাই বললাম! আত্মদোষ স্খালনের চেষ্টা করল পুঁটিরাম।

না—না—আমিই বলছি। আশু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল।

এরপর দিনের বেলায় কয়েকবার এলো আশু। ঘুরলে ও পাড়ায়। সকলের সঙ্গে দেখা হ'ল—ডালিম চোখের জল ফেলে বলল, সব শুনিছি। এইখানেই থাক না কেন!

আশু হেসে বলল, থাকব—আগে তুনিয়াটা ঘুরে দেখি। এ হাটে যত আজব জিনিস আছে—সব দেখে শুনে নেই।

আজব জিনিসের কারখানাই বটে তুনিয়া! চলতে চলতে যে মানুষ জীবনের পথ থেকে হারিয়ে যায় একদিন—সেই ফিরে আসে অন্যদিন—অকস্মাৎ। মাঝখানে তখন সময়ের সমুদ্র—

তবু এপার ওপারের অপলকা সেতুটি এক এক সময়ে তৈরী হয়ে যায় কেমন করে।

সেদিন আলু গস্ত করে পাথুরেমহলের ঘাটে স্নান করছিল আশু—একখানা ভাউলে জাতীয় নৌকা এসে পাশে ভিড়ল। দিব্য সাজানো-গোছানো ঘরবারান্দাযুক্ত নৌকা—ভব্য সাজের মাঝিমাল্লা। ভিতরে উঁকি মেরে যেটুকু দেখা গেল—তাও সৌখীন বাবুভায়েদের বৈঠকখানার মত; ছবি, হারমোনিয়ম, আয়না, দেয়ালগিরিতে ঝকঝকে।

একটি গৌরাঙ্গী সুবেশা মেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মুখেচোখে ওর সকালের রোদ পড়তেই মুখখানা জ্বল জ্বল করে উঠল। কি আশ্চর্য ফরসা ওর মুখখানা!

ওর মুখে ঈষৎ কালো উদ্বেগের ছায়া। আশুকে সামনে পেয়ে ওকেই বলল, আপনাদের এখানে ভাল ডাক্তার পাওয়া যাবে কি?

আশু হতভম্বের মত চেয়ে রইল মেয়েটির পানে। এ মুখ যেন চেনা-চেনা। যেন গতজন্মের পরিচয়ের আলো কোন কোন অঙ্গে পড়েছে। হাতের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি—চোখের ঈষৎ চঞ্চল চাহনি—নীচের ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটি তিল।

ওর অবাক দৃষ্টি দেখে মেয়েটি হাসল। বহু পুরুষের চোখে এমন দৃষ্টি ও বহুবার দেখেছে।

ওর হাসিটি কিন্তু বিদ্যুৎ হয়ে আশুর দূর-অন্ধকার-মাখা অতীতকে উদ্ভাসিত করে দিল। ঠিক ঠিক, অতীতদিনের··· সেই শ্রীরাধাই বটে।

শ্রীরাধা বলল, সত্যই কি ভাল ডাক্তার নেই এখানে? একটা ইনজেক্‌সন যিনি করতে পারেন?

ডাক্তার আছেন বই কি।

তাহলে আপনি যদি দয়া করে আমার লোকটাকে পৌঁছে

দেন সেখানে। বলবেন—একটা ইন্‌জেক্‌সন করে আসতে হবে—ওষুধপত্তর এখানেই আছে। বলবেন—লিভারের ব্যথা উঠেছে বাবুর। এমন হয় মাঝে মাঝে। যত শীগগির হয়—

ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলো আশু। কৌতূহল প্রবলই হয়েছিল বাবুটিকে দেখবার জন্য। ইনিই কি সেই তেলিনি-পাড়ার জমিদারবাবু—যাঁর বাগান বাড়ীতে—

বাইরে একটি আয়না ছিল। মাঝিমাল্লারা চুল আঁচড়াতো—কখনো বা মাথার পাগড়িটা ঠিক করে নিত তার সামনে দাঁড়িয়ে। আশু সেটার উপর ঝুঁকে পড়ল। না, অতীতের কোন চিহ্নই এ দেহের কোনখানে নাই। কোঁকড়া চুল অনেক-দিনই নির্ম্মূল হয়েছে—পূরন্ত গাল দুটিও ভেঙ্গে চোয়ালের হনু উঁচু হয়েছে। ভাসন্ত চোখ দুটি ডুবে গেছে তার গহ্বরে। সেই সুমার্জিত···কচি কচি মুখে এখন খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল—কপালে একটা কাটা দাগ—লোমবহুল হাত দু'খানিতে বলিষ্ঠ এক যুবা পুরুষের কর্কশকাঠিন্য।

ভিতরে উঁকি মারল আশু। কাশ্মিরী শালে সর্বাঙ্গ ঢেকে পড়ে আছেন বাবু। দেহ শীর্ণ হয়েছে সামান্য—মুখের রং তেমনি ধবধবে। যন্ত্রণায় এক একবার কুঁকড়ে উঠছেন—উঃ আঃ শব্দ করছেন।

আশুর মনে হল, বাবুর জীবন-সূর্যও পাটে বসতে আর দেরি নাই। সেই গানটা—যেটি বিবেক সেজে প্রায়ই গাইত অমনি মনে পড়ে গেল।

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন।
উতরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন ?
আয়ু সূর্য অস্ত যায়, দেখিয়ে না দেখ তায়

উঃ-উঃ-উঃ—বাবু চীৎকার করে উঠলেন। গেট আউট, গেট আউট—

ডাক্তার বাইরে এসে মেয়েটিকে বললেন, এমন রুগী নিয়ে বার হওয়া উচিত হয় নি, ফিরে যান।

মেয়েটি বলল, বুঝতেই তো পারছেন—জেদী মানুষ। বললেন—নৌকা করে কাশী যাব। সবাই মানা করল—শুনলেন না।

মর্ফিয়া দিয়েছি—পুরো একটা দিন ঘোর থাকবে। ফিরে যান বাড়ীতে। ডাক্তার নেমে গেলেন নৌকা থেকে।

মেয়েটির মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। অস্থির হয়ে উঠল সে। বলল, ওঁকে বাড়ীতে তুলে দিয়ে—উঃ, এমন দুর্ভোগেও মানুষ পড়ে! আশুর পানে ফিরে বলল মেয়েটি, এখানে ভাল খাবার পাওয়া যায়? আমার এই লোকটি সঙ্গে যাচ্ছে—যদি দয়া করে কিনে দেন।

দিচ্ছি।

ধন্যবাদ আপনাকে। কত যে করলেন আমাদের জন্যে! মেয়েটি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইল ওর পানে।

সেই মেয়ে—অপাঙ্গে যার আগুন জ্বলত—সর্বাঙ্গে যার বিদ্যুৎ খেলত—যার পানে চোখ মেলে চাওয়াই যেত না!

ছেলেটা বড় লাজুক। সে বলেছিল একদিন।

নৌকা থেকে নেমে এল আশু। খাবার কিনে পাঠিয়ে দিল লোকটার হাতে। নিজে আর এলো না। দূর থেকে দেখল ভাউলের মুখ ফিরছে কলকাতার দিকে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে কাঠের দরজা হেলান দিয়ে। বিকালের নরম রোদে চকচকে ভিজে চুলগুলো ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ছে মুখেচোখে কপালে। মূর্তিমতী প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। এই অপরাহ্ণ তুলনাহীন।

কালনার পর শান্তিপুরের বড়বাজার তারপর গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর—রাণাঘাট। আশুর নৈশ-অভিসার চলতেই লাগল।

বদ্যিনাথ বলল, কেমন বলেছিলাম না—যে গরু একবার গু খেতে শিখেছে তার মুখে খোলবিচালি কখনো ভাল লাগে! শুনছি যা উপায় করছে—ফুঁকে দিচ্ছে বদখেয়ালী করে।

গুপী বলল, বললাম—তোদের দলে ভিড়িয়ে নে—দিনকতক ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ফুর্তি করা যাক—তা তোরা শুনলি নে!

কালীপদ বলল, মক্কেলকে পাচ্ছ কোথায় যে হাত বুলোবে? ও এখন নানান ঘাটে জল খেয়ে খেয়ে ফিরছে।

ছ্যা—ছ্যা—দিনকতক কি সতীপনাই করলে! গুপী নাক সিঁটকে বলল। পুঁটেটা নেহাৎ বেহায়া—তাই আবার ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে হ্যা হ্যা করে হাসে!

পিসি কান্নাকাটি করে বাড়ী এলে। ওরে রেশো, তোর জন্যে যে কান পাততে পারি নে গাঁয়ে। এমন নেশাভাঙ করে বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াচ্ছিস কোন্ ছঃখে! তোকে আবার বিয়ে দিয়ে সংসারী করি—একবার মুখের কথা খসা বাবা।

হবে—হবে। আশু হাসে। সংসার নিশ্চয় পাতব—আগে নেশাটা কাটুক পিসি।

ওরে, এ নেশা কাটে না—সব্বনাশ করে মানুষের।

কাটবে পিসি—কাটবে। আবারও হাসে আশু। সব জিনিসের শেষ আছে—মানুষও শেষ হয়, নেশা কাটবে না! তা ছঃখু কেন পিসি, তোমার হাতে তো টাকাকড়ি দিয়ে যাই। ভাতকাপড়ের অভাব তো রাখিনি।

ওরে চালডাল ভাতকাপড়েই কি সব ছঃখু ঘোচে! বেচাকালী ডুকরে কেঁদে ওঠে।

আশুর মনও ডুকরে কাঁদে। চালডাল ভাতকাপড়ই সব নয়—মানুষের সংসার কোনরকমে চললেই চলে না—খেয়েদেয়ে জীবন ধারণ করলেই মানুষ বেঁচে থাকে না। সংসারের—স্বাদ যাতে, সংসার সুন্দর হয় যা পেলে, যে দক্ষিণা হাওয়ায়

শান্তিতে ভরে ওঠে সংসার, তারই অন্বেষণ করে মানুষ। সে দুর্লভ জিনিস কচিৎ কারও ভাগ্যে মেলে। শুধু বাইরে হাত পাতলেই তা মেলে না—মনের তলা থেকে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। তাকে খুঁজতে গিয়েই না রাই কলঙ্কের পসরা তুলে নিয়েছিল মাথায়। একদিন তাকেই উদ্দেশ করে গেয়েছিল যাত্রার দলের রাই :

বলো বলো ননদিনী বলো সবারে

ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।

সেই কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে ডুব দিতে না পারলে পরম নিধি মেলে না। তাকে চাই···তাকে চাই জীবন ভরাতে···সংসার ভরাতে তাকে যে চাই।

ওদিকে নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া, এদিকে বর্ধমান, মেমারী ছাড়িয়ে চুঁচুড়া হুগলী চন্দননগর শ্রীরামপুর। অন্বেষণের পালা চলেছে আশুর। কলঙ্ক সাগরের ঢেউ মাথায় নিয়ে ছুটে চলেছে আশু—জীবন ভরাতে সংসারের স্নিগ্ধ ছায়ায় খানিক জিরিয়ে নিতে।

চৈত্র এলে আশু বলল, এবার সন্ন্যেসী হব পিসি—একমাস হবিষ্যি করব—তারকেশ্বর গিয়ে নীল পালব।

বাবা তারকনাথ তোর সুমতি দিন।

তারকেশ্বরেও পাতি পাতি করে খুঁজল আশু—কিন্তু মানুষের সমুদ্রে মানুষ হারালে মানুষের সাধ্য কি খুঁজে বার করে!

পর পর দু'বার গেল তারকেশ্বরে। এক একদল সন্ন্যাসী আসে —আশু তাদের পাছু নেয়। সে দল ছেড়ে অন্য দলে ভিড়ে যায়। যত দেহপণ্যাদের ঘরে ঘরে উঁকি মারে।

সবাই সন্দেহ করে। মানুষটা চোর, না চর? কে জানে কেমন মানুষ! চোখে নেশা নেই—মনে নেশা নেই—অথচ নেশার রাজত্বে সর্বদাই ঘুরছে!

তৃতীয়বার সন্ন্যাস নিল না আশু। দূর দূরান্তে ছোটাছুটিও কমলো যেন।

বেচাকালী বলল, এইবার বিয়েথা করে সংসারী হ—একটি মেয়ে দেখি—কেমন?

আশু হেসে বলল, ব্যস্ত কি পিসি, হবে।

বেচাকালী কেঁদে ফেলল, হবে কি আমি চিতেয় শুলে! তোর মায়ের কপালে সুখ ছিল—কোন্ কালে ড্যাংডেঙিয়ে চলে গেল ভাগ্যিমানী—আমি রইলাম খোয়ার ভোগ করতে। গতর পড়ে আসছে—নজরের যুত নেই—এই বুড়ো বয়সে কি কষ্টে যে সংসার করছি—তা ওই ওপরে যিনি আছে—তিনিই জানে!

আশু চেয়ে দেখল সত্যিই বেচাকালী বুড়ো হয়ে পড়েছে। এই ক'বছরে খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে পড়েছে। ওরও দিবা অবসান হল বলে।

আশু মমতাভরা কণ্ঠে বলল, এবার মন দিয়ে কাজকম্ম করবো পিসি—কিছু টাকা জমিয়ে নেই—তারপর বিয়ে করব। আসচে বার—সত্যি বলছি—

॥ বত্রিশ ॥

গড়ের বাজারে আশুর দোকান জমে উঠল। সব আনাজপাতি ফেলে আলুর পাইকারি ব্যবসায় ধরল আশু। আর কালনায় ছোটে না সে—কালনা থেকে গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে আলু আসে ওর দোকানে। সেই আলু এখানকার ফড়েরা নেয়ই—রানা-ঘাট কৃষ্ণনগরেও চালান যায়। বৈশাখ থেকে চৈত্র—বেশ কিছু সঞ্চয় করল আশু।

এবারও নীলের পর্ব পালন করল না আশু। আলু কেনার মরসুমে সেটা সম্ভব হল না। রাঢ় থেকে গাড়ী আসছে তো

আসছেই। এবার আলুর ফলন হয়েছে প্রচুর। কিছু ধরে রাখতে পারলে বর্ষাকালে বেশ কিছু জমবে।

চৈত্রে গাজনের বাজনা বেজে উঠলে ওর বুক দুরদুর করে। সমুদ্র-মন্থন-করা হলাহল যেন চৈত্রের আগুন-ঝরা রৌদ্রের রূপ নেয়। আক্রোশে চরাচর দগ্ধ করার ভয় দেখায়। আশুর দেহে আর মনে সেই বিষের ক্রিয়া। হাতজোড় করে বলে, রক্ষা কর ঠাকুর, দেব দেব মহাদেব মঙ্গল কর জগতের।

বাবা তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে—মহা—দেব।

আশুর দোকানের সামনে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে সন্ন্যাসীর দল। ওরা গাঁয়ের দল নয়, পথ-চলতি দল। সন্ন্যাস নিয়ে ভিক্ষা করতে করতে হাঁটা পথে চলেছে তারকেশ্বরে। সেখানে নীলের ব্রত সাঙ্গ করে ট্রেনে চেপে ফিরবে। ওদিকের পাড়া গাঁ থেকে আসছে দল—পানপাড়া, বেলেডাঙ্গা, দে-কোল, টিয়াবালি, গয়েশপুর, রঘুনাথপুর, রানাদি, ছোট রানাঘাট, ভালকো দিগনগর, ফুলেনবলা—আসচেই যাত্রী। ওরা গ্রামের মাঝখানের সোজা পথ ধরে চলে না। একটু ঘুরে দোকানপসার লোক-বসতির মাঝখান দিয়ে যায়। ঠিক ভিক্ষা পাওয়ার জন্য নয়। ঠাকুরের মানতশোধের মাহাত্ম্যকে এমনি একটি সহজাত দৈন্যের দ্বারা উপরে তুলে ধরার আগ্রহে ঘোরা পথ দিয়ে যায়। এদের বিশ্বাস সংসারীর গর্ব মানঅভিমান পদমর্যাদা সব কিছুকে এমনি করে ধুলিসাৎ করে না দিলে দেবতার দুয়োরে ঠিকমত পৌঁছানো যায় না। যে দেবতা পার্থিব সম্পদকে তুচ্ছ করে অত্যন্ত সাধারণ হয়ে সাধারণ মানুষের মাঝখানে থাকতে ভালবাসেন—তিনি সত্যই জ্ঞানরূপী, তাঁকে ঐশ্বর্য দিয়ে পূজা করে ভোলানো যায় না। তাঁর মত হয়ে তাঁকে আরাধনা করলেই সত্যকারের পাওয়া হয়।

জেলখানার ছোট রোয়াকে বসে অবনীশবাবু গম্ভীরস্বরে

বলেছিলেন কথাগুলি। ওঁর মুখে শোনা-কথা নতুন হয়ে বাজছে কানে। সেদিন বেজেছিল—আজও বাজছে।

কিন্তু আজ যে দলটা এইমাত্র চলে গেল—ওরা তো পথ-চলতি যাত্রী নয়, ওরা সোজা গুপ্তিপাড়ার খেয়াঘাটের পথ ধরল না। কালনার পথেই ফিরল যেন।

কি রাশুদা, হাঁ করে চেয়ে আছো যে এখনও? মেয়েটার যা চেহারা, মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতোই। কালিপদ হেসে উঠল।

আশু চকিতে ফিরে চাইল ওর দিকে। কি বিশ্রী হাসি। ওর ছোট ছোট চোখে লোভের চেহারাটা জ্বলজ্বল করছে এখনও। ইচ্ছে হল আড়াইসেরা বাটখারাটা ছুড়ে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেয়।

আজ মনটা এমন হলো কেন? একটু আগে বিষ্ণুকে তাড়না করেছে। আবার অতিকষ্টে ক্রোধ দমন করে হাসল আশু। বলল, ও দলটি কোথাকার বলতে পার?

ওরা হচ্ছে কালনার দল। মোষমর্দ্দিনী তলায় যে দোকান-গুলো আছে না—

বাধা দিয়ে আশু বলল, বুঝেছি। তা ইদিকে এসেছে কেন? তারকেশ্বরে যাবে যদি—

ওরা সব গাঁয়েই এক একদিন ভিক্ষে করতে যায়। গেল-বারও এসেছিল এগাঁয়ে—তোর মনে নেই?

হয়তো এসেছিল। কাজে ব্যস্ত ছিল আশু—ভাল করে লক্ষ্য করেনি।

বদ্যিনাথ বলল. এবার শুনি তো কালনার বিদ্যেধরীরাও পেরায় সব সন্ন্যেসী হয়েছে। পুঁটিরাম সেদিন দুঃখ করছিল—কালনায় রাতবাসের ভারি কষ্ট!

আশু দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে নেমে এল পথে।

ওকি, এখনই দোকান বন্ধ করলি কেন? আমি যে আধ মণটাক আলু নেব বলে এসেছি।

ওবেলা নিও। তাড়াতাড়ি খেয়াঘাটের পথ ধরল আশু।

এত তাড়াতাড়ি এসেও ওদের ধরা গেল না।' খেয়ার নৌকা সেইমাত্র ছেড়ে গিয়েছে—সন্ন্যাসীরা ঘনঘন মহাদেবের জয়ধ্বনি করছে। গঙ্গার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে ঝপঝপ করে দাঁড় পড়ছে, দাঁড়ের গা বেয়ে ঝরছে তরল কাঁচের ধারা।

মেথিডাঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল আশু।

পারানি নৌকা ফিরে আসতেই নৌকায় চেপে বসল মাঝির কাছ ঘেঁসে।

বলল, মাঝি ভাই, এই মাত্তর যাদের পার করে দিলে—ঐ নীল-সন্ন্যেসীর দল—ওরা কোথাকার লোক জান?

কাঁল্লার নোক।

কোন্ পাড়ায় থাকে?

উই হেথায় হোথায়—মোষমদ্দিনীতলায়, পাথুরেঘাটায়, ছোট দেউড়িতে—সবখানের নোক আছে।

তাইত, এই দুপুরবেলায় সারা কালনা চষে বেড়ান সম্ভব হবে কি? ওপারের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল আশু।

পার হয়ে বাজারে এলো। সামনেই লালজীর বাড়ীর সিংদরজায় ঘড়িঘরে ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং। এগারটা। লালজীর দেউলের মধ্যে কারা যেন মহাদেবের জয়ধ্বনি দিচ্ছে। দলটি কি একশো আট শিবমন্দির পরিক্রমা করছে?

বাজার প্রায় ভেঙ্গে এসেছে—দু'একজন শব্জীবিক্রেতা বাছপড়া জিনিস নিয়ে তখনও খরিদ্দারের প্রত্যাশা করছে হয়তো। ওরা কোঁচড় ভরে নিয়েছে মুড়িমুড়কি তেলেভাজা গজা আর ফুলুরি বেগুনি। জল খেয়ে ঝাঁকা গুছিয়ে বাড়ীর পথ ধরবে।

ওদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করল আশু, শব্দটা কোত্থেকে আসচে?

গাজনের সন্ন্যেসীরা নালজীর বাড়ীতে ঢুকেছে—তেনারাই জিকির দিচ্ছে।

বকুল গাছের ছায়ায় সরে এলো আশু। প্রতীক্ষা করতে লাগল দলটি কখন বা'র হবে। আজ জানতেই হবে ওই মেয়েটির আস্তানা—ওর পরিচয়।

একটু পরে জয়ধ্বনি দিতে দিতে দলটি বাইরে এলো।

ওদের পিছু পিছু সেই ঠিকানায় পোঁছল আশু। ভগবান-দাস বাবাজীর আখড়ার কাছে পড়োমত বাড়ীতে গিয়ে ঢুকল মেয়েটি। আধবুড়ো সন্ন্যাসী সে বাড়ীতে ঢুকল না—দলের সঙ্গে মিশে অন্যত্র চলে গেল।

বাড়ীর মধ্যে যাওয়া উচিত হবে কিনা ভাবছে—একটি আধা বয়সী মেয়ে বেরিয়ে এসে আশুকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই গা?

আশু ঈষৎ থতমত খেয়ে বলল, এই যে সন্ন্যেসীর দলটা এই দিকে গেল—

গেল তো গেল—উই পচ্ছিম দিকে। তা তুমি কেন চোরের মত দেঁড়িয়ে আছ বাবু! মতলব তোমার ভাল নয় তো। খর-খরিয়ে উঠল মেয়েটি।

দু'একজন লোক জুটে গেল। কি বোষ্টম মাসী—কি হয়েছে?

এই দেখনা গো—নোকটাকে শুধুচ্ছি—কাকে চাও? তা না রাম—না গঙ্গা! বলে সন্ন্যেসীরা কমনে গেল? একটা ছুতো!

সবাই প্রায় মারমুখী হয়ে উঠল। রীতিমত কোলাহল জমে উঠল।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। ভাগ্যিস বেরিয়ে এলেন—না হলে একটা বিশ্রী ব্যাপার হতো।

কি বাবা—কি হয়েছে তোমার?

আশুকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন।

মেয়েটি বলল, ওনার চলন-বলন ভাল নয় বাবাজী, মনে হয়—

বৃদ্ধ হেসে বললেন, তোমরা যাও। আমি বোঝাপড়া করে নিচ্ছি।

ওকে বিশ্বেস করবেন না বাবাজী—বেগানা লোক।

জয় রাধারাণী! হাসলেন বাবাজী। বিশ্বাস কাকেই বা করি! সেই শঠ চূড়ামণি—কোন্ ছলে যে কি অঘটন ঘটাচ্ছেন! আশুর পানে চেয়ে বললেন, দু'টি প্রসাদ পাবে বাবা? এস।

আজ্ঞে আমি—

এসো। শঠের লীলা তিনিই জানেন ভাল। তুমি আমি তো দাবার ঘুঁটি। যেটুকু ছক বাঁধা—সেইটুকুতেই চলা। যেমন চালাচ্ছেন—তেমনি চলছি। জয় রাধারাণী।

আশ্চর্য মানুষ! আশুর শুকনো মুখ দেখে কেমন করে টের পেলেন ওর খাওয়া হয়নি?

ভিতরে অল্পই জায়গা। একখানি ঘরের কোলে ফালিমত একটু দালান—তার কোলে ছোট উঠোন। উঠোনের একধারে একটি তুলসীমঞ্চ। সেই মঞ্চতলে গলায় আঁচল দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে সেই গৈরিকবসনা মেয়ে।

আশ্চর্য হল না আশু। ধর্মমত নিয়ে কলহ বিসম্বাদ ওদের গাঁয়ে বড় একটা চোখে পড়ে না। সব পাড়াগাঁয়েই শিব কিংবা বিষ্ণু অভিন্ন। যে লোক ব্যোম ব্যোম গালবাদ্যে ধুতুরা বিল্বদলে শিবের অর্চনা করছে—সেই মানুষই পরদণ্ডে তুলসী চন্দন উপচার জোগাড় করে দিচ্ছে নারায়ণ পূজার। দেবতার ভিন্ন রূপ— পূজাপদ্ধতিও স্বতন্ত্র, কিন্তু দ্বৈতরূপ নিয়ে কারো মাথাব্যথা নাই। রুদ্রের বেশ পরে শ্রীহরির বেদীমূলে প্রণাম নিবেদনটা তাই বিসদৃশ লাগল না।

মাথা তুলল মেয়েটি—মুখ ফেরাল। চোখে চোখ মিলল—তার পর টলে পড়ল বেদীমূলে। আশুও তখন কাঁপছে থর থর করে।

॥ তেত্রিশ ॥

স্বামীজীর নাম প্রেমানন্দ। তাঁরই মুখে বাকী গল্পটা শুনল আশু।

গাজনের মেলা শেষ হয়ে গেছে—আরামবাগ থেকে তারকেশ্বরে ফিরছিলাম। তখনও গাজনের দোকানপাট কিছু কিছু রয়েছে, যাত্রীও রয়েছে কিছু কিছু। বাবাকে দর্শন করে দুধপুকুরে ডুব দিচ্ছি—দেখি একটি মেয়ে—আমার পাশেই চান করছিল—যেন তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। যেখানে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি—সেখানে চাতালটা চওড়া পা ফসকে জলে তলিয়ে যাবার কথা নয় তো। অথচ মেয়েটি তলিয়ে যাচ্ছে। কে যেন বলল, ধরুন-ধরুন ওকে—ডুবে যাচ্ছে।

হঠাৎ মেয়েছেলের গায়ে হাত দিই কেমন করে। কিন্তু দেখছি ও ক্রমশ ডুবছে। দেখতে দেখতে সবটাই ডুবে গেল। জলের উপর ভেসে রইল চুলের গোছা। কোন সন্দেহ রইল না—মেয়েটি ইচ্ছে করেই ডুবেছে। দৈবচালিত হয়ে চুলের গোছা ধরে টেনে তুললাম ওকে। জ্ঞান হলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। ও কাঁদতে লাগল। পরিচয় না দিয়ে উল্‌টে অনুযোগ করল, কেন বাঁচালেন আমায়?

বললাম, যিনি তোমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন জীবন দিয়ে—তিনিই বলতে পারেন কেন? তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা তো একটি আঙুলও নাড়তে পারি না মা।

ওকে নানামতে বোঝালাম। মন দিয়ে শুনল আমার কথা। তারপর আমার সঙ্গে এখানে এলো।

এখানে এসেও ওর মনের দুঃখ যায় না। ভাল করে খায় না, হাসে না, গল্প করে না—খালি চোখের আড়ালে আড়ালে থাকতে চায়। বুঝতে পারি কাঁদে—রাতেও ঘুমোয় না ভাল করে। সত্যিই বিপদে পড়লাম ওকে নিয়ে। শেষে কি রাধারাণীর আশ্রমে প্রাণী-হত্যা হবে! অনেক করে বোঝালাম। ক্রমে কিছু বুঝল। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ হয়। সেই আসরে এসে বসতে লাগল। একদিন ব্রজগোপীদের আত্মসমর্পণের ব্যাখা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা সত্যিই কি দেহ নোংরা হয় না?

বললাম, যে দেহে শ্রীভগবান বাস করেন—সে দেহ কি নোংরা হয় মা! আসলে মনের পাপচিন্তাই দেহকে নোংরা করে। মন শুদ্ধ করে তাঁর শরণ নিলে তিনি সব পাপ তাপ ধুয়ে দেন। পথের ধুলোয় গাছের পাতার রংটা ময়লা হয়—বৃষ্টির জল পড়লে আবার চকচক করে ওঠে।

ও বলল, শুধু দেহ তো নয় বাবা, মন যার নোংরা—

বললাম, পাপ হল আকাশের মেঘ—কখনো আসে, কখনো যায়, আকাশের নীল রং কিছুক্ষণের জন্য ঢাকে—সে রং মুছে ফেলে ওর সাধ্য কি। মন আর দেহ ওরা হল ওই মেঘের মত—আত্মা হ'ল আকাশ। মনের বৃত্তিগুলো প্রবল বায়ু—ওরাই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় মেঘেদের। কিন্তু আত্মা কখনো চঞ্চল হয় না—নোংরা হয় না। ওর সঙ্গে যোগ রয়েছে যে পরমাত্মার—কি না ঈশ্বরের।

কি জানি কি বুঝল ও—এরপর আর কোন প্রশ্ন করেনি কোনদিন।

এসব কথা আশুও বুঝল না—চুপ করে চেয়ে রইল প্রেমানন্দের পানে।

প্রেমানন্দ বললেন, একদিন উমা-মা বলল, বাবা, বড় ভুল করেছি—আমার স্বামীকে কষ্ট দিয়ে এসেছি। তার ফলও দিয়েছেন

ভগবান। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন তিনি—বাছাকে তো ধরে রাখতে পারলাম না।

. আশুও চমকে উঠল। তবে আবারও কি তার পাপের ফল বয়ে সন্তান এসেছিল? আকণ্ঠ বিষে জর্জরিত রুগ্ন সন্তান? আর্ত-কণ্ঠে ও বলে উঠল, বাবা, তাহলে বাঁচল না ছেলেটা?

প্রেমানন্দ বললেন, কে কাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে বাবা, সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

আশু কেঁদে ফেলল। বলল, মঙ্গলময় কেন খালি খালি কষ্ট দিচ্ছেন আমাদের?

প্রেমানন্দ বললেন, না বাবা, পরীক্ষা করছেন তিনি। সোনাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি করে নিচ্ছেন। দুঃখ না পেলে মানুষ কি মানুষ হয় বাবা? মানুষ আকাশ দেখতে পায় না, জমিন চিনতে পারে না, মনের অহঙ্কারও তার ঘোচেনা।

চুপ করে রইল আশু। এ সব তত্ত্বকথা সে বুঝতে পারে না—বুঝতে চায়ও না। শুধু বুঝছে—সে আগে যা ছিল—এখন তা নেই। আকণ্ঠ বিষ পান করে দুঃখের জ্বালায় অনেক জ্বলল সে, জ্বালার নিবৃত্তি হল না পৃথিবীর কোন জিনিস দিয়ে। তা বুঝি হয়ও না। এক একটা মানুষ চিরকালই জ্বলে, কষ্ট ভোগ করে।

প্রেমানন্দ পূর্বপ্রসঙ্গে এলেন। বললেন, ওকে বলেছিলাম বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা নিতে, নেয়নি। বলেছিল, তাহলে পাপ হবে যে। আমাদের শিবের ঘর—দেবতা হলেন মহাদেব, নীলের সন্ন্যাস নিই আমরা—ব্রত ফেলতে পারব না।

বললাম, বেশ, তাই নিও। যে রূপে যার রুচি—যাতে যার মন ভরে। শিব হলেন জগৎ-পিতা—দুর্গা জগৎ-মাতা। বাপ-মায়ের ছেলে হয়ে থাকা ভাল, নির্ভাবনার কথা।

আশু জিজ্ঞাসা করল, তাই যদি, শিবের পূজোয় যে ফুল লাগে বিষ্ণুর পূজোয় তা কেন লাগে না?

প্রেমানন্দ হাসলেন, ও হলো গিয়ে বৈধী নিয়ম। এক একটি রূপের সঙ্গে মিলিয়ে উপকরণগুলি তৈরী—গুণের সঙ্গে মিলিয়েও অর্চনার বিধি। যেমন ধুতুরাফুলের রং সাদা—মহাদেবের রং সাদা সাদা। মানে জ্ঞানমূর্তি। জ্ঞানকে আমরা আলোর সঙ্গে তুলনা করি—অন্য রং সেখানে খাপ খাবে কেন! শক্তি হলেন সৃষ্টি-রূপিণী—কামনার রং, তাই লাল জবাফুল দিয়ে ওঁর পাত্থ'খানি সাজাতে ভাল লাগে। বিষ্ণু পালনকর্তা—প্রেমেরও ঠাকুর। নানা রঙের ফুলে ওঁর তৃপ্তি। আসলে এই সব মূর্তি ধরে ধরে আমরা চেষ্টা করি অখণ্ড এক বস্তুর সামনে পৌঁছতে। সেখানে কোন রং নেই, রূপ নেই, সীমা নেই, আকার নেই,—কাজেই কোন বিরোধ নেই। এই যে দেখছ চালাখানা—বাঁশ বাখারি দড়ি খড় সবই আলাদা, আলাদা, অথচ এটা বাঁশও নয়, বাখারিও নয়, দড়িখড়ও নয়—এ চালা-ঘর,—একটি আশ্রয়। রোদ জল হিম ঠেকানো একটি আশ্রয়।

একটু থেমে বললেন প্রেমানন্দ, তবু ও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা নেয় নি। বলেছিল, আমার মনে হিংসা রয়েছে বাবা, যে আমাকে নোংরা করতে চেয়েছিল--তাকে খুন করতে গিয়েছিলাম,···তার দেহ থেকে রক্তপাত করেছি বাবা—বিষ্ণুমন্ত্র আমি নিতে পারব না।

আশুর পাংশু মুখ দেখে প্রেমানন্দ বুঝলেন, ওর মনেও দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে। বড়ই ব্যথা পেয়েছে ছেলেটি।

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললেন, আমিও কম অপরাধ করছি না বাবা। আপনমনে বকেই চলেছি। আহারের সময় হ'ল, এসো। ঠাকুরকে অন্ন নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করিগে চল। জয় রাধারাণী।

এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে উমাকালীকে আর দেখতে পেলে না আশু।

আহার শেষ করে নাটমন্দিরে বিশ্রাম করছে আশু—প্রেমানন্দ

এসে বললেন, মায়ের আমার লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুতেই কাটছে না বাবা। তুমি এসো। এবার বোঝাবার পালা তোমার।

আশু উঠে দাঁড়াল। নাটমন্দির ঘুরে একটা ঘরের পিছন দিকে এসে দাঁড়ালেন প্রেমানন্দ। আঙুল তুলে বললেন, ওই লেবুতলা দিয়ে ঘুরে যাও বাবা—ওই ঘরের পিছনে ছোটমত একটি চালা আছে—সেইখানে।

সেইখানে দাওয়ার উপর উপুড় হয়ে শুয়েছিল উমাকালী। ঘুমোচ্ছিল না, নিঃশব্দে কাঁদছিল। কান্নার বেগটা এক একবার বেড়ে উঠছে, সারা দেহ কেঁপে উঠছে থরথর করে।

একবুক ঝড় নিয়ে আশু এসে দাঁড়াল সেখানে। ওর বুকেও কম জ্বালা নয়। সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উঠেছিল—তা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছে দু'জনেই। সে বিষ কণ্ঠে রেখে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারেনি কেউ। শিবকে আরাধনা করা সহজ—শিবের মত হওয়া সহজ নয়।

উমাকালীর পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসল আশু। ধীরে ধীরে ওর পিঠের উপর একখানি হাত রেখে অল্প একটু নাড়া দিয়ে ডাকল, উমা।

উমাকালীর দেহটা বেশী করে দুলে উঠল। তীরবেগে দাওয়া থেকে উঠে দূরে সরে গেল। আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, না, না।

আশু বহুক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসে রইল। উমাকালী কাছে সরে এলো না। বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল না, ওগো, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার দোষঘাট নিও না—ক্ষমা কর।

বুকের মাঝখানে একরাশ ঝড়ো হাওয়া পাক খেয়ে উঠল। আশু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল উমাকালীর দিকে।

তার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে উমাকালী। আবার পিছু হঠে—আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, না, না।

ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে পালাল উমাকালী।

খানিক বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থেকে আশু ফিরে গেল নাটমন্দিরে।

॥ চৌত্রিশ ॥

আশুর কাছ থেকে পালাল বটে উমাকালী, সেই মুহূর্তে অতীতটাও সামনে এসে দাঁড়াল। না, না, এ কিছুতেই সম্ভব নয় আর। ঘরে ফেরা চলবে না কিছুতেই। সেদিনও কি কম চেষ্টা করেছিল ঘরে ফিরতে? পথ ছিল জানা, তবু ঝড়-বাদলের অন্ধকারে সে পথ চিনতে পারল না কেন? উমাকালী দোষ দেয় না কাকেও—আপনমনে কাঁদে। কপাল চাপড়ায় আর বলে, এই—এটার জন্যেই আমি আবাগী সব খোয়ালাম! আমার তেজ অংখার, হবে না?

মা বলেছিল, এবারটি থাক উমা—পেটে-পোয়ে নাই বা করলি উপোসকাবাস।

না—তা'লে অমঙ্গল হবে। তুমি মানা করো না। জিদ ধরেছিল উমা।

ভাল—তবে বেলেডাঙ্গার বুড়ো শিবের মানত কর—তারকেশ্বরে যাবি কেমন করে? কে নিয়ে যাবে তোকে?

কেন—সুবলের মাসী যাবে—অন্নর দিদি যাবে—বলাইএর বুন আন্না যাবে—আর কেশবদাও বলেছে যাবে। আপত্তি খণ্ডন করেছিল উমা।

যাবার দিন সুবলের মাসী আর কেশব ছাড়া কেউ সঙ্গী রইল না। সুবলের মাসী বুড়ো মানুষ—ও অন্য মানুষকে দেখবে কি—ওকেই দেখবার জন্যে মানুষ চাই।

কেশব বলল, আমি তো রয়েছি—দেখব শুনব। দুটো দিন বৈত না; ভেবো না জ্যেঠিমা।

ছেলেবেলা থেকেই জানাশোনা। বলতে গেলে ওকে অন্য বাড়ীর ছেলে বলে ভাবাও শক্ত। ছেলেবেলাকার মাখামাখি থেকে সম্বন্ধ একটা গড়েও উঠব উঠব হয়েছিল—উমাকালীর বাবা যদি ধমক না দিত। ছেলেটি কিন্তু ভাল। সে সব অপমানের কথা একটুও গায়ে মাখেনি। শহর থেকে ফিরে এসেও সেই আগেকার মতই উঠোনের আগড় ঠেলে ডেকেছে, কেমন আছ গো জ্যেঠী? উমাকেও আপন বোনটির মত দেখে। কোথায় চুল বাঁধার ফিতে কাঁটা, কোথায় কাপড়-আটকানো একটা প্রজাপতি, সোনারঙের কাঁচের চুড়ি এনে দিয়েছে শান্তিপুরের রাসের মেলা থেকে। দাম দিতে গেলে নেয় নি। হেসে বলেছে, আমার বুনকে যদি দিতাম—মা বুঝি কড়ি শোধ করতে আসত! আমি পর বলেই তো···

চোখে জল আসে বই কি এমনধারা কথা শুনলে! ওরা আত্মীয়ের চেয়েও বড় বইকি! দু'টো দিনের জন্য উমাকালী যদি মানত শোধ দিতে ওর সঙ্গে তারকেশ্বরে যায়—যাক না। একা তো যাচ্ছে না ওরা। সাত-আটজনের মত একটা দল—বেগানা গাঁয়ের মানুষ নয়—আর বুড়ো হলেও সুবলের মাসী কম জাহাঁবাজ নয়, হাঁকডাকে দশটা পুরুষমানুষের সমান।

সারা পথটাই ভগবানকে ডাকতে ডাকতে চলা। একটা দলের সঙ্গে মিশল আরেকটা দল—তার সঙ্গে আরও একটা। যেন বর্ষাকালের নদীনালায় জলের ঢল নামল। সরু সরু খালের বুক, বিলের গর্ভ—নয়নজুলির ফাঁক—সব ভরিয়ে নদীর মরা খাতে এসে জমল যত জল। মরা নদী জেগে উঠল—একূল ওকূল হাঁরিয়ে সরুনদী হল সমুদ্র। সে জলের স্রোত কি, ডাক কি, দাপাদাপি কি।

জয় বাবা তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে—মহাদেব।

তারকেশ্বরে তেমনি সমুদ্র দেখল উমাকালী।

একটি ছোট চালাঘরে এসে উঠল ওরা। এক জায়গায়

সকলকে কুলোলো না। ঘরের মধ্যে তক্তাপোষে রইল সুবলের মাসী আর উমাকালী, দাওয়ায় গাঁয়ের আরও দু'জন বুড়ো সন্ন্যাসীর সঙ্গে কেশব। দুয়োরে খিল দেওয়ার রেওয়াজ নেই বুঝি তীর্থক্ষেত্রে? আর যে ঘুপচি ঘর—চৈত্রের গরমে এমনিতেই প্রাণ আইঢাই করছে—একটি মাত্র দুয়োর বন্ধ করলে দম বন্ধ হতেও দেরী হবে না।

সারাদিনের ক্লান্তির ভারে দেহ এলিয়ে ছিল—শোওয়া মাত্র কোথায় প্রাণজ্বালান গরম—কোথায় বা ভাবনাচিন্তা!

তবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে ছিল উমাকালী। সারাদিনের ঢাক পেটানোর শব্দ আর সন্ন্যাসীদের চীৎকার এমন করে সমস্ত শরীরে বাসা বেঁধেছিল যে—বাইরের শব্দ থামলেও—মনে তার জের মিটেও মিটছিল না। সেই শব্দতরঙ্গে দোলা খেতে খেতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল উমাকালী।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল কি না মনে নেই—বুকটা হঠাৎ কেমন ভারী হয়ে উঠল যেন। বাইরের গুমোট ঘুমের ঘোরেও শরীরকে নাড়া দিতে কসুর করছে না! ভারী পাথর একটা চেপে বসছে বুকে—দম বন্ধ হয়ে আসছে!

সেই চাপেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চীৎকার করে উঠল উমাকালী। ওর মুখে কার একখানা হাত ঠেকল যেন—চাপা ভীরুকণ্ঠে কে যেন বলল; চেঁচিও না—আমি।

ততক্ষণে সম্পূর্ণ জেগে উঠেছে উমাকালী। বুঝতে পেরেছে আমিটা কে। আরও কি বলতে যাচ্ছিল উমাকালী, এক ঝলক গরম নিঃশ্বাস ওর মুখখানা ঝলসে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে উঠল, উমা···উমা।

উমাকালীর সারাদেহে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সমস্ত শক্তি এক করে দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিল কামাতুর পশুর দেহটা।

সেটা হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল নীচেয়। লোহায় আর পিতল কাঁসায় ঠোকাঠুকি লেগে একটা শব্দ হ'ল—ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্। সেইসঙ্গে নরকণ্ঠের আর্তনাদ—উঃ—বাপরে—গেছিরে—খুন করলে রে।

উমাকালীর দেহে মত্ত হস্তীর বল এসেছে তখন। ও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়েছে নীচেয়। লাফিয়ে পড়ে আর একটুও দাঁড়ায়নি—দাওয়া পার হয়ে পথ ধরে ছুটতে আরম্ভ করেছে। ছুটতে ছুটতে একেবারে বাবা তারকেশ্বরের নাটমন্দিরের সামনে। নাটমন্দিরের আলো নিভে গেছে তখন, আবছা অন্ধকারে অনেকখানি জায়গা থমথম করছে। সেখানেও কাতারে কাতারে লোক শুয়ে রয়েছে—কেউ কেউ তখনও জেগে—বাবার স্তোত্র পাঠ করছে গুণগুণ স্বরে। অন্ধকারে এখানে ওখানে কলকের আগুনও জ্বলছে। দুঃস্বপ্নের রাজ্য ছাড়িয়ে এলেও পৃথিবীটা এখনও দূরে মনে হ'ল। মনের উত্তেজনা খানিকটা কমেছিল ইতিমধ্যে। রাত ফরসা না হওয়া পর্যন্ত মন্দিরের একধারে অপেক্ষা করবে ঠিক করে উমাকালী একটু ঘুরে দুধপুকুরের সামনের চাতালটায় এসে বসল।

ফুরফুর করে হাওয়া বইছিল—মাথার দপদপানি অনেকটা যেন কমল। বসে বসে ঠিক করল—ফরসা হলেই রেলগাড়ীতে করে চলে যাবে দেশে। দেশ ছাড়া কোথায় বা আশ্রয়!

দুধপুকুরের জল তারার আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। বেশ বড় পুকুর। লম্বা একটা আরসীর মত পড়ে রয়েছে সামনে। আকাশের তারাগুলো কাঁপছে—কি জল কাঁপছে কে জানে—জল চিক্‌চিক্ করছে। দিনের বেলা এই আরসীটা থাকবে না। অনেক লোক মিলে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে। চকচকে জল ঘোলা হয়ে উঠবে। একই পুকুর—রাতে আর দিনে কি তফাৎ!

পিছনের দিকে পূবের আকাশে ঘোর কাটলে উমাকালীও এই পরম সত্যটা বুঝতে পারল। রাতের পৃথিবী আর দিনের

পৃথিবীতে কত তফাৎ! যেখানে ফিরে যাব মনে হচ্ছিল এতক্ষণ —সেখানে কি করে ফিরবে! দেহ নোংরা হয়েছে—মন ঘিন-ঘিন করছে। আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল মাড়িয়ে ঠাকুরঘরের চৌকাট পেরুবে কোন মুখে। উঃ—বড় তেজ করে না বাপের বাড়ীতে চলে এসেছিল! কোথায় রইল সে দর্প! এখনও তুর্গন্ধমাখা নিঃশ্বাসটা মুখের ওপর লেগে রয়েছে যে! হাজারবার ধুলেও এই তুর্গন্ধ যাবে কি!

পুকুরে নেমে মুখেচোখে জল দিল উমাকালী। ভোরের হাওয়া লাগল ভিজে মুখে—ভিজে মাথায়। মাথা আর মুখ যেন জুড়িয়ে গেল। এক একটি পইঠা পার হয়ে গলা জলে গিয়ে নামল উমাকালী। ইচ্ছে হল আরও নামে—আরও খানিকক্ষণ বসে থাকে জলে। জল মায়ের মত আদর দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরেছে। এই আদরের ঢেউ খেয়ে খেয়ে আর একটি অজানা দেশে যদি চলে যায়! সে তো ভালই হবে। কেউ বকবে না—ছি-ছি করবে না, বাঁকা হাসি হাসবে না। বাঃ, সেই তো ভাল।···বার বার ডুব দিতে দিতে বলল, এই ভাল—এই ভাল।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

সাধুর মুখে প্রথম শুনল,—এ ভাল নয়। আত্মহত্যা মহা-পাপ। একটা জন্ম তো নষ্ট হয়ই—পর পর অনেক জন্ম ধরে ভোগ করতে হয় জ্বালা। মরণেই জীবনের শেষ নয়,—দেহটা যদিও থাকে না। সেই দেহহীন জীবনের জ্বালা নাকি এর হাজার গুণ বেশী। ভয় লাগল। তাহলে কি হবে? সব আশ্রয় যে হারিয়েছে আমার—কোথায় যাব?

আমার সঙ্গে এসো মা।

মা! আবারও মা! সাধুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখল

উমাকালী। প্রশান্ত সে মুখ। হাসিতে ভরা। বাবার মুখের সঙ্গে একটুও মেলে না। বাবার মুখ এত সুন্দর ছিল না। রাগলে তা কালীবর্ণ হত। হাসলেও পদ্মফুলের মত সুন্দর দেখাত না। সেখানে নির্ভরতা ছিল—সম্পূর্ণ নির্ভয় ছিল না। এ মুখের হাসিটা কি অদ্ভুত আর কথার মধ্যে কি আশ্বাস। সদ্য দাগা-খাওয়া প্রাণ কেমন যেন তাজা হয়ে উঠল।

ওঁর সঙ্গে আশ্রমে এসেই উঠল উমাকালী।

আশ্রমে নিরাপদ আশ্রয় ছিল—কিন্তু সেখানেও আর একটা ঝড় অপেক্ষা করছিল। দেহমনের লাঞ্ছনা তো কম ভোগ করেনি উমাকালী। যার জন্য এত পরিশ্রম—এত কষ্টস্বীকার, সে রইল না। উমাকে সর্ব্বস্বান্ত করে দেবলোকে চলে গেল সেই শিশু।

আছাড়পিছাড় করে কাঁদল না এবার। অনুশোচনার জ্বালাটা শুধু প্রবল হয়ে উঠল। এ তারই পাপ। তার দর্প অহঙ্কার ভেঙ্গে দিতে শাস্তি দিলেন মহাদেব। স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে আসার ফল এমনি করেই দিলেন ঠাকুর।

প্রেমানন্দ আশ্বাস দিলেন আবার। মা ভুল বুঝছ—ঠাকুর কাউকে সাজা দেন না—উনি হচ্ছেন প্রেমময়। ওঁর সাজানো সংসারে আমরা এক একটি অবোধ পুতুল। ওঁরই হাতে গড়া—ওঁরই ইচ্ছায় চলা পুতুল। পুতুলকে ভেঙ্গেচুরে সৃষ্টিকর্তার কি আনন্দ হয় মা? না। যে ছেলে হাঁটতে শিখছে—সে কতবারই তো আছাড় খায়—আঘাত পেলে বাপ-মা কি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলে—বেশ হয়েছে! যেমন কথা শোননি—তেমনি হয়েছে! না ছুটে গিয়ে কোলে তুলে আদর দিয়ে ছেলেকে ভোলায়। তেমনি উনিও। আমাদের বাপ-মা এক ধারে। আমাদের ব্যথা ওঁর মনেও বাজে—আমাদের দুঃখে কাঁদেন উনিও। ওঁর এক নাম পতিত-পাবন জানতো মা।

কিছুই জানে না উমা। দেবতার কথা এমন করে শোনেনি তো কোনদিন। এমন করে বুঝিয়েও দেন নি কেউ। শুধু জানে সংসারের পথটা খুব সোজা নয়। দুধারে গর্ত আছে নর্দ্দমা আছে—হোঁচট খাবার ভয় আছে। দেবতা পাপের শাস্তি দেন কঠোরভাবে। ছেলেবেলায় দোষঘাট করলে বাবা যেমন কঞ্চি দিয়ে আগাপাছতলা বেতিয়ে দিতেন—তেমনি একগাছা শক্ত বেত সর্বদাই উঁচিয়ে রেখেছেন ভগবান—বেতালে পা পড়েছে কি– সপাং সপাং ঘা পড়বেই। তাইতো এত মানত—প্রার্থনা—দোষঘাটের জন্য মাথা কোটাকুটি—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন। দেবরোষ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নানা পূজাবিধি, বারব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, পুণ্যঅনুষ্ঠান। দেবতা যত না ভক্তির বস্তু—ভয়েতে রয়েছেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে। শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কালী, বিষ্ণু এমন কি অল্পে তুষ্ট মহেশ্বর পর্যন্ত সামান্য দোষত্রুটি সহ্য করেন না।

প্রেমানন্দের আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের যুগল মূর্তি—। হাতে মোহন বাঁশী, মাথায় শিখি চূড়া—পীতধড়া পরনে—গলায় বন ফুলের মালা, নাকে উজ্বল মুক্তা। ত্রিভঙ্গিম ঠাম মোহন মূর্তি।···এ মূর্তি প্রেমেরই আধার—। বামে শ্রীরাধিকা—তেমনিই মোহিনী। শ্রীরাধার পরনে নীল শাড়ী—নাকে নীল বেসর। কৃষ্ণ আর গৌরতনুতে মাখামাখি একটি মূর্তি—প্রেমঘন মূর্তি। প্রেমানন্দ কতভাবে—কতবার এর ব্যাখ্যা করেছেন—, সে সব শক্ত শক্ত কথা মনে রাখা শক্ত বইকি। উমা শুধু বুঝেছে—উনি প্রেমময়—, নিজের হাতে তৈরী পুতুলের ওপর ওঁর ভারি মমতা।

এ ছাড়া স্থান মাহাত্ম্যের কথাও বলতেন প্রেমানন্দ।

জানন্মো—এ হ'ল পরম পবিত্র স্থান—বৈষ্ণব-তীর্থের অগ্রগণ্য। আবার আদ্যাশক্তিরও লীলাপীঠ।

প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় ভজন কীর্তন সাঙ্গ হলে প্রেমানন্দ বলতেন অম্বিকা-কালনার ইতিহাস।

কেমন করে দেবীমাহাত্ম্য এ জায়গায় প্রকট হল জান মা?—সে অনেককাল আগেকার কথা। এ জায়গায় তখন অগম বিজন বন। মা গঙ্গা সেই বিজন বনের ধার দিয়েই বয়ে যেতেন। আর যাঁর জমিদারি ছিল এ জায়গাটা—সেই বর্দ্ধমানরাজ মাঝে মাঝে এখানে আসতেন গঙ্গাস্নান বা শিকার করতে। রাজা আসতেন মেলাই লোকজন সঙ্গে করে—যেন চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে।

একবার স্নান করে ফিরছেন রাজা—শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি তাঁর কানে এলো। থমকে দাঁড়ালেন রাজা। এই বিজন বনের মধ্যে শাখঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করে কে? কার আরাধনা চলছে সঙ্গোপনে! খোঁজ—খোঁজ।

হাঁ—গঙ্গার ঠিক পাড়ের উপর—জঙ্গল যেখানে আরও ঘন—সেইখানেই ছোট্ট একখানা কুটীর। সেই কুটীরে একটি সিঁন্দূর-চর্চ্চিত মাটির ঘট স্থাপনা করে দীর্ঘ জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী পূজা আরাধনা করছেন দেবতার। তিনি হলেন শক্তিরূপিনী দেবী অম্বিকা। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী জননী। পূজকের পরিচয় নিয়ে জানলেন রাজা—উনি হলেন ঋষি অম্বঋষ।

বনের বাইরে হাতী রেখে দেবীস্থানে পায়ে হেঁটে এলেন ভক্তিমান রাজা। ঋষিকে প্রণাম করলেন সাষ্টাঙ্গে। করজোড়ে মিনতি করলেন—দেবী কৃপা করে যদি দর্শন দিয়েছেন—প্রকট হন তাহলে সর্বসমক্ষে। দেবীর মন্দির নির্মাণ করে—এই নগরীতে স্থাপনা করি তাঁকে। নগরীর নাম হোক অম্বিকা। সুরধুনী-পাদধৌতা—রাঢ়ের এই নগরী দেবীর নাম নিয়ে ভুবনে বিখ্যাত হোক।

তাই হ'ল। পাঠান আর মোগল আমলে—বাংলার একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল এটা—আরও একটি কারণে বৈষ্ণব-তীর্থে পরিণত হল অম্বিকা-নগরী।

মাগো—এ যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমি। তাঁর প্রথম বিগ্রহ-মূর্তি এই ধামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাপ্রভু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরী করিয়েছিলেন সেই বিগ্রহ-মূর্তি—বর্ণে রূপে প্রতিটি অঙ্গের মাধুর্যে সে মূর্তির তুলনা নাই বৈষ্ণবজগতের কোন তীর্থে।

কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল ?

সেও এক সখ্যলীলাভিনয়ের কাহিনী। ওই যে ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছটা দেখেছ—গৌরমন্দিরের পথে যেতে—কালনার খেয়াঘাট পার হয়ে বাজারের প্রান্তে—ওইখানে গৌরীদাস নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন নিমাইএর সতীর্থ। একসঙ্গে পড়াশোনা শাস্ত্রালোচনা ক্রীড়াকৌতুক শুধু নয়—প্রগাঢ়ভাবে দু'জনে ভালবাসতেন দু'জনকে। গৌর আর গৌরীদাসের এমনই প্রেম-বন্ধন যে—শান্তিপুরে এলেই প্রভু নিজ হাতে বৈঠা বেয়ে গঙ্গা পার হয়ে আসতেন অম্বিকায়। প্রভুর নিজ হাতে বাওয়া সেই বৈঠা আজও গৌরমন্দিরে রয়েছে, আর রয়েছে তাঁর হাতে লেখা একখানি পুঁথি। আর ওই বিগ্রহ—প্রভু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরী করিয়েছিলেন। সে এক অদ্ভুত লীলা।

প্রভু তখন সন্ন্যাস নিয়ে এসেছেন শান্তিপুরে। ইচ্ছা হল বাল্যবন্ধু গৌরীদাসকে দর্শন দিয়ে যাবেন। শেষবারের মত প্রভু এলেন কালনায়। দুই বন্ধুর মিলন হল যেখানে—সেইখানেই ছাতার মত ছায়া মেলে আছে ওই অদ্ভুত তেঁতুলগাছটা। ওই-খানেই প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন গৌরীদাস। বলেছিলেন—তোমাকে তো যেতে দেব না আমি। যাও তো দেখি—কেমন শক্তিমান তুমি !

প্রভু হেসে বলেছিলেন, আমি যে প্রেমদাস গৌরী—প্রেমের বাঁধন কাটবার শক্তি আমার নাই। তুমি অনুমতি না দিলে—'

না—অনুমতি আমি দেব না। আরও শক্ত করে আলিঙ্গন করেছিলেন গৌরীদাস।

আচ্ছা—কথা দিচ্ছি—তোমার কাছে আমি চিরদিন বাঁধা থাকব। মরদেহে না হোক্—মূর্তিতে। হেসে বলেছিলেন গৌর-সুন্দর।

তারপর তিনিই দাঁড়িয়ে থেকে এমন অদ্ভুত দারুমূর্তি তৈরী করিয়ে ছিলেন—যার প্রতিটি অঙ্গ আর লাবণ্য যেন দর্পণের প্রতিবিম্ব। দুই ভাই—নিতাই গৌরের মূর্তিই তৈরী করিয়ে ছিলেন মহাপ্রভু।

পণ্ডিত গৌরীদাসের মন ভরেনি তাতে। বলেছিলেন, না প্রভু, এই অচল দারুমূর্তি নিয়ে কি করব আমি? তোমাকেই চাই আমি।

হেসে বলেছিলেন গৌরসুন্দর, ও তো অচল দারুমূর্তি নয় বন্ধু, ও যে আমারই মত সচল।

যেমন বলা—অমনি সজীব হয়ে উঠেছিল মূর্তি—সচল হয়েছিল। আর গৌরসুন্দর পরিণত হয়েছিলেন অচল দারুমূর্তিতে।

অমনি গৌরীদাস ছুটে গিয়ে সচল দারুমূর্তিকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, আমি এই সচল মূর্তিই চাই।

সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর হ'ল। প্রভু সচল হয়ে হেসে উঠলেন, দারু-মূর্তি হল স্থানুবৎ।

গৌরীদাস যতবারই সচল মূর্তিকে ধরে বলেন—আমি একে চাই—ততবারই এই পরম লীলার প্রকাশ তাঁকে মোহমুগ্ধ হতচেতন করে দেয়। সচলে আর অচলে কোন তফাতই ধরতে পারেন না পণ্ডিত।

প্রভু হেসে বললেন, তফাত কিছুই নাই গৌরীদাস। যে অচল সেই সচল। প্রেমের অভিষেক না হলে জীবন রক্ত-মাংসের দেহেও নাই—দারুতে নাই। এই মূর্তিই তুমি নাও পণ্ডিত—তোমার ভালবাসাতেই এ সজীব হয়ে উঠবে। তোমার জীবনকাল

পর্যন্ত এই মূর্তিতে তোমার সঙ্গে ভজন কীর্তনাদি লীলা করব। যা খেতে দেবে তাই খাব।

জান মা, প্রভুর জীবনকালে নিজের তত্ত্বাবধানে তৈরী সেই দারুব্রহ্ম আছেন এই অম্বিকায়। তিনি যে জীবন্ত মূর্তি—সে পরীক্ষাও কয়েকশত বছর পরে আর একবার হয়েছিল।

সে কাহিনী আর একদিন বলেছিলেন প্রেমানন্দ।

জান মা—মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়ে প্রভু গৌরীদাসকে আর একটি কথা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শোন পণ্ডিত—তুমি অপ্রকট হলেও এই মূর্তিতে নিত্য বিরাজমান থাকব আমি। যতদিন কোন ভক্ত পাঁচ দণ্ডকাল একাগ্রচিত্তে আমাকে দর্শন করে আকর্ষণ করে নিয়ে না যায়—ততদিন তোমার মন্দিরেই থাকব আমি। এই জন্য আজও সামান্যক্ষণমাত্র মন্দিরের দরজা খুলে রাখার ব্যবস্থা।

একটু থেমে বলেছিলেন প্রেমানন্দ, প্রায় দেড়শো বছর আগে এই কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা হয়ে গেছে মা। সেদিন এক অকিঞ্চন বৈষ্ণব গৌরমন্দিরের সামনে এসে দেখলেন মন্দিরের দরজা বন্ধ। দেখে তাঁর মনে ভারি কষ্ট হ'ল। পুরোহিতকে অনুনয় করেও যখন মন্দিরের দুয়োর খোলাতে পারলেন না—তখন উচ্চৈঃস্বরেই দুঃখ প্রকাশ করলেন, সব জায়গাতেই তো দেখি দুয়োর খুলে ঠাকুর দেখানোর ব্যবস্থা—এমন কোন জায়গা কি নেই যেখানে মন্দিরের দুয়োর আপনি আপনি খুলে গিয়ে ঠাকুর দর্শন দেন।

যেমন বলা—মন্দিরের দুয়োর খুলে শ্রীগৌর-নিতাইবিগ্রহ প্রকট হলেন।

পূজারী তো স্তম্ভিত। বুঝলেন—এই অকিঞ্চন বৈষ্ণব সামান্য ব্যক্তি নন—ইনি অনায়াসে শ্রীবিগ্রহের প্রাণসত্তাকে আকর্ষণ করে নিতে পারেন।

পূজারী আকুলকণ্ঠে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু, তুমি যদি গৌরীদাসের প্রাণধন হও তো দরজা বন্ধ কর।

অমনি দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আগন্তুক বৈষ্ণব অলৌকিক লীলার আস্বাদ পেয়ে শ্রীপাট অম্বিকায় শেষ দিন পর্যন্ত রয়ে গেলেন। ইনিই নামসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীভগবানদাস বাবাজী। নামব্রহ্মের মন্দিরের আঙ্গিনায় এঁর সমাধি দেখেছ তো মা।

কাহিনী শেষ করে প্রায়ই বলতেন প্রেমানন্দ, মাগো—এ বড় পবিত্র স্থান—শান্তির জায়গা। মনটাকে ঠিক করে নাও, পরম শান্তি পাবে।

॥ ছত্রিশ ॥

নিত্য গঙ্গাস্নান—শ্রীশ্রীনামব্রহ্মজীউর মন্দির দর্শন—ভজন কীর্তন শ্রবণ—তবু মন কেন উচাটন হয়? কেন এই পবিত্র ধাম পার হয়ে গঙ্গার ওপারে একখানি ভাঙ্গাবাড়ীর আঙ্গিনায় নিত্য-দিন ক্ষণে অক্ষণে ঘুরে আসে উমা! সেখানে কীর্তনের মধুর রব নাই—সংসারের কচকচি কোলাহলে কান ঝালাপালা, মধুর বদলে রসনায় ঝরে বিষ, আনন্দ খুঁজতে গিয়ে হাহাকারে ভরে ওঠে চিত্ত—অথচ তারই লোভে মন-ভ্রমরা গুনগুনিয়ে ঘুরে মরে সেই জায়গাটিতে। সে কমলদল নয়—কণ্টক বনই—অথচ তারই উপর যত মমতা।

প্রতিদিন এই দ্বন্দ্ব। শান্তি পায় না উমা। মাঝে মাঝে বলে আমার সাজা না হলে বুঝ আসচে না বাবা। আমি প্রাশ্চিত্তি—করব।

কি করবে মা?

নীলের উপোস দেব—মহাদেবের পূজো করব—সন্ন্যেসী হব।

বেশ—মন যদি তাতে শান্ত হয়, করবে।

পাপ হবে না?

বলেছি তো পাপ ধরেন না আমাদের ঠাকুর।

আমার অংখার যাতে নষ্ট হয়—যার কাছে দুষী সে যাতে দোষঘাট না ধরে তেমনি ব্যবস্থা করে দাও বাবা।

বল—কি তোমার মন চাইছে?

নীলের সন্ন্যেসী হয়ে এ গাঁ সে গাঁ ভিক্ষেয় বেরুবো। সেই ভিক্ষের চালে হবিষ্যি করব—বাবার পূজো দেব।

বেশ—তাই করো।

একজন বৃদ্ধমত সন্ন্যাসীকে বললেন প্রেমানন্দ, মাকে নিয়ে যেয়ো সঙ্গে—যেখানে তোমরা যাবে সঙ্গে নিও।

এমনি করে কয়েকবার কাটল!

একদিন উমাকালী বলল, বাবা, আমরা তো ফি বারে রাঢ়েই যাই ভিক্ষে করতে, এবার গঙ্গা পার হয়ে নদেয় যাই যদি—

বেশ তো—এবার গঙ্গার ওপারেই যেয়ো। বলে দেব নিতাইকে।

কিন্তু—কথা আটকে গেল। চুপ করে মাথা হেঁট করে রইল উমা।

বল মা—কোথায় বাধছে তোমার?

ওইদিকে যাব বলে প্রেথম থেকে ইচ্ছে ছিল—তবু যেতে পারিনে বাবা।

কেন মা?

ওনারা ওইখেনেই থাকে তো। আমার শ্বশুরবাড়ী।

একথা এতদিন বলনি কেন মা! এ ঠিক হয়নি—এত কাছে থেকে—

না বাবা—সেজন্যে নয়। উমা ঢোক গিলে বলল, ওখেনে আমার জায়গা নেই—গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে।

তবে কেমন করে যাবে মা।

যেতে যে হবেই বাবা। দোষঘাট করলাম—পালিয়ে গেলাম,

লুকিয়ে রইলাম! এ কি ঠিক হচ্ছে বাবা! যে যা বলে বলুক—ওদের ঠেঁয়ে ভিক্ষে নিয়ে আমার পাপের প্রাশ্চিত্তি করবো।

আবার পাপ! হাসলেন প্রেমানন্দ।

হাঁ বাবা পাপ। একশোবার বলব পাপ। কুলকাঠের আঙরা জ্বলছে বুকে—। অংখার করে তেজ দেখিয়ে চলে গিছলাম—সেই তেজ না ভেঙ্গে কিছুতেই যে শান্তি পাচ্ছিনে বাবা। ওদের কাছে ভিক্ষে চেয়ে বলব—ওগো, তোমরা দেখ গো দেখ—আমার অংখার আজ ভেঙ্গেছে নীলঠাকুর। ফলের আশায় ঘর ছেড়েছিলাম—তেমনি প্রিতিফল দিয়েছে ভগমান।

তাই হ'ল। গঙ্গা পার হয়ে ভিক্ষেয় চলল সন্নাসীর দল। কিন্তু গাঁয়ে গেলেই কি ঘরের দুয়োরে যাওয়া চলে? কাছে যাওয়া আরও কঠিন। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইল উমাকালী। খুব পরিচিত নয় পথ বা গ্রামের মানুষ। শ্বশুরবাড়ীর পথঘাট অনেক বয়স পর্যন্ত অচেনা থাকেই—ঘোমটা-ঢাকা বউএর কাছে ক'টি মানুষেরই বা পরিচয়! বাজারের মাঝখানের—দোকানগুলো এর আগে কয়েকবারই দেখেছে উমাকালী, কিন্তু দীর্ঘ ঘোমটার ভিতর থেকে সে দেখার পরিচয়টা পাকা হয় নি। পর পর দু'খানা ময়রার দোকান। তার পাশে ছোটমত একটা হাঁড়ী-কলসীর দোকান, একটি পানের দোকান—একটা দর্জির দোকান, ঘড়ির দোকান·· মোড়ের মাথায় নীল-সন্ন্যেসীদলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেরুয়া চাদরের একটা খুঁট চেপে ধরে দৃষ্টিকে আরও দূরে মেলে দিলে উমাকালী। তার পরেও একটা দোকানে—আলুর পাহাড় সাজিয়ে দাঁড়িপাল্লা হাতে দোকানী চেয়ে আছে এইদিকে। খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফে মুখখানা জঙ্গলের মত দেখাচ্ছে—তারই মাঝখানে জ্বলন্ত কয়লার টুকরো দুটো জ্বলছে। দাঁড়িপাল্লা হাতে করে ঝুঁকে পড়েছে লোকটি। কয়লার টুকরো দু'টো বাতাস পেয়ে আরও জ্বলন্ত হয়ে

উঠেছে—একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে লোকটা। দলটার দিকে নয়, উমার দিকে। অনিচ্ছায় অস্বস্তিতে কেমন করে উঠল উমা। ওদিকে চাইবে না ঠিক করে ওই দিকেই ফিরে গেল দৃষ্টি। আর সঙ্গে সঙ্গে নিকষকালো আকাশ চিরে বাঁকা আগুনের লেখা ফুটে উঠল—, আলো গিয়ে পড়ল অত্যন্ত চেনা বস্তুটির উপর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

দেহ টলে উঠেছিল কি? না হলে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চোখে কেন ভর্ৎসনার ইসারা! কেন হুকুম দিল সে—ফিরে চল! ফিরেই চলল তারা। কাছে এসে আবার দূরের পথ ধরল। যাবার আগে দুর্নিবার বাসনা আবার টানল পিছনে। দৃষ্টির প্রদীপ—ময়রার দোকান, পানের দোকান, হাঁড়ী-কলসীর দোকান, ঘড়ির দোকান, দর্জির দোকান ছুঁয়ে ছুঁয়ে সোজা গিয়ে আলো ফেলল আলুর দোকানের উপরে। আবার বিদ্যুৎ—আবার সারাদেহে কম্পন। ওদিক থেকেও আলোর তীরটা ছুড়ে দিয়েছে কে। চারিদিকের অপরিচয়ের মধ্যেও একটি পরম পরিচয়ের বার্তা যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। তারই হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কি আকুলি-বিকুলি উমাকালীর! সন্ন্যাসীর দলকে পিছনে ফেলে একাই ছুটে চলল সে।

তারপর।...

আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী প্রেমানন্দকে বলল, বাবাজী, কাল থেকে আমি এর ভার নিতে পারব না। একে সামলে নিয়ে পথ চলা আমার সাধ্য নয়।

মাটির সঙ্গে মিশে গেল উমাকালী।

প্রেমানন্দ অল্প একটু হাসলেন।...মধুরকণ্ঠে বললেন, জয় রাধারাণী। যাও মা—খানিক জিরিয়ে নিয়ে ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা কর।

উমাকালী বলল, ভোগ রাঁধতে পারব না বাবা—আমার মন যে নোংরা।

ছি-ছি, একি কথা মা। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন—তিনি জানেন না তাদের মনের খবর? সান্ত্বনার স্বরে বললেন প্রেমানন্দ।

জানেন না—জানেন না বাবা। উমাকালী অকস্মাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল উঠোনে। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল।

প্রেমানন্দ নিকটে এসে ওর মাথায় ডান হাতখানি রেখে স্নিগ্ধস্বরে বললেন, ছি-মা, কাঁদে কখনও! তুমি যে মা আমার রাধারাণীর অংশ—দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে খাঁটি সোনা তোমরা। তাইতো তোমাদের দুঃখতাপ ভোগ করতে হয়। কিন্তু দুঃখতাপ তো পাপ নয় মা। ও যে কষ্টিপাথর।

বাবা—মন যদি নোংরা না হবে তো—তার সামনে কেন যেতে পারলাম না? সব খুইয়েছে যে—তার কিসের ভয়? কাকে ভয়? অংখার কেন গেল না বাবা?

একটু খাদ সোনাতে থাকেই যে মা—না হ'লে গহনা হয় না। ওইটুকু আছে বলেই প্রভুর লীলারস আস্বাদ করতে পারি আমরা। আমরা হাসি কাঁদি নাচি গাই। মাগো, মনের ভার ভাসিয়ে দিতে পারছ না এখনও? তাঁর ভুবনে খেলার পুতুল হয়ে খেলাটাকেই সার মনে করতে পারছ না?

তাড়াতাড়ি উঠে বসল উমাকালী। বলল, অপরাধ হয়েছে বাবা—নিজের কষ্টটাই বেশী মনে হচ্ছিল।

প্রেমানন্দ মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন, জয় রাধারাণী।

অন্তরাল থেকে ভাল করে দেখল উমা—সেই মানুষ—হাসি-খুশিভরা মানুষ—কেমনই হয়ে গেছে। দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা বিষণ্ণ থমথমে মুখ—ক্লান্তিতে এলিয়ে-পড়া আধবোজা চোখ—শিথিল চলাফেরা ওঠাবসা। কথা কইতেও কত কষ্ট

হচ্ছে। মানুষটা আছে এই পর্যন্ত। কেন এমন হল? ভাবতে ভাবতে জ্বালা ধরল মনে—ছট্‌ফট্ করতে লাগল উমা।

ঠাকুরের ভোগ হল—প্রসাদ পেলে সকলে। প্রসাদের থালাটা নিয়ে পিছনের চালাঘরে ফিরে এলো উমা। থালা সামনে রেখে বসল খেতে। কিন্তু সাধ্য কি প্রসাদের গ্রাস মুখে তোলে! হু-হু করে দু'চোখে বন্যা নামছে—চোখের জলে লোনা হয়ে উঠেছে প্রসাদ—বুকের ভারি পাথরটা কিছুতেই সরাতে পারছে না ও।

অন্ন প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে থালাটা ঘরের মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখল। মন যে এত দুর্ব্বল—তা কি করে জানবে উমা। যে জমিতে ফিরে যাওয়া চলবে না—সে জমির ফসল নিয়েই হিসাব সুরু হলো মনে। আশ্চর্য্য মন! দুর্বল—অবুঝ—অবাধ্য মন।

দাওয়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল উমাকালী। চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে বলল, ঠাকুরগো, আমার হ্যাংলামি ঘুচিয়ে দাও—বল দাও। তোমার পায়ে মাথামুড় খুঁড়ে মরছি—তবু দয়া করছ না কেন?

অপরাহ্নে প্রেমানন্দ একবার এলেন এদিকে। উমাকালীর ভুলুণ্ঠিত দেহটা দেখে বুঝলেন—ওখানে কি ঝড় বইছে। প্রবোধ দেওয়ার কোন চেষ্টা না করে ফিরে গেলেন নিঃশব্দে। আশুকে এসে বললেন, যাও বাবা—এবার তোমাকেই সব ঠিক করে নিতে হবে।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

আশু ফিরে এলো নাটমন্দিরে।

ওকে ফিরে আসতে দেখে প্রেমানন্দ বললেন, কি বাবা, বোঝা-পড়া শেষ হ'ল?

আশু শুকনো মুখ তুলে চাইল ওঁর পানে। খানিক চুপ

করে থেকে মাথা নাড়ল। বলল, না বাবা। ভাবছি কি করি! আমি অবিশ্যি মন ঠিক করেই এসেছি—এখন ওনার মত হলেই—

প্রেমানন্দ বললেন, ভাল কথা। তার আগে আর একটা কথা ভেবেছ তো? তুমি যেন গ্রহণ করলে ওকে, সমাজ তোমাদের গ্রহণ করবে কেন? সইতে পারবে তার জ্বালা?

আশু শুষ্ককণ্ঠে বলল, দেশে যদি না যাই?

প্রেমানন্দ হেসে বললেন, দেশ থেকে যেন পালাবে, নিজের মন তোমাকে রেহাই দেবে কেন বাবা? সেখানেও জ্বালা তো কম নয়। যে ঘর একদিন ভেঙ্গে গেছে তা কি নতুন করে বাঁধতে পারবে?

আশু মাথা নেড়ে বলল, না, পারব না। তালে কি করব আমি? হতাশায় ওর কণ্ঠস্বর প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলো। দু'হাত জোড় করে বলল, আপনি বলে দিন বাবা—কি করব আমি? দেশ ছেড়ে ঘর ছেড়ে শান্তি পাব না, ওকেও ছাড়তে পারব না। কি করব আমি? অস্থির হয়ে উঠলো আশু।

মধুর হাসিতে ভরে উঠল প্রেমানন্দের মুখ। বললেন, এর জবাব তো আমি দিতে পারব না বাবা···এ জবাব তোমাকেই দিতে হবে। তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। যে শক্তি তোমাকে পাঁকের মধ্যে চুবিয়েও পাঁকের দাগটি গায়ে লাগতে দেয়নি—তারই সঙ্গে বোঝাপড়া কর বাবা। তিনি শক্তি না দিলে সাধ্য কি তোমার ঘর খুঁজে পাও! জয় রাধারাণী।

আশু অধীরকণ্ঠে বলল, ওযে কিছুতেই বুঝছে না বাবা! আপনি যদি একবার—

প্রেমানন্দ তেমনি হাসতে হাসতে বললেন, আমি নয়—আমি নয়। বুকে হাত দিয়ে বললেন, এইখানে যিনি আছেন—তাঁকে

ওকালতনামা দাও। তিনি অবশ্যই বুঝিয়ে দেবেন। জয় রাধারাণী।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখনই প্রদীপ জ্বেলে তুলসীমঞ্চে প্রণাম করতে আসবে উমা। তার আগেই হৃদয়-মঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে নিতে হবে। না হলে তুলসী তলার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।

এক মুহূর্তে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে আশু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ছোট চালাঘরখানির দিকে। সেইখানে দাওয়ার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে উমাকালী।

চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়াল আশু। ভাবল আমায় দেখে আবারও কি পালিয়ে যাবে উমা? পরক্ষণেই সঙ্কল্পে অটল হয়ে বলল মনে মনে, যাক না পালিয়ে—আমিও থামবো না। কত ছুটবে আর! আমিও ছুটবো ওর পিছু পিছু। কতদূর যাবে? পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যায়ও যদি—আমিও যাব। কতদিন ধরে ছুটবে? একদিন—দু'দিন, একমাস—এক বছর? ব্যস, ব্যস—আমিও ছুটবো—চলতে চলতে পা ব্যথা হয়ে গেলেও থামবো না। একদিন না-একদিন ওর নাগাল ধরবই। ধরবই—ধরব।

জোরে জোরে পা ফেলে ছোট্ট চালাঘরখানির দিকে এগিয়ে গেল আশু।